HB ®

INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

PIONEER®
নিখুঁত লেখার খাতা

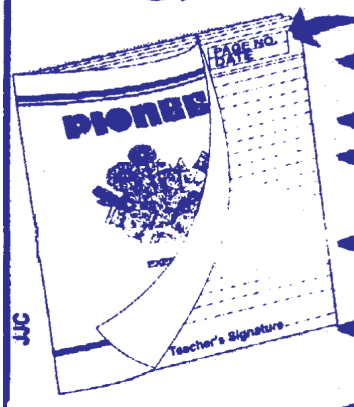

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature.......................... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

Design's For Modern Living
Neycer
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
Sales Office : 15, College Street, Kolkata-700012
Ph : 2241-7149 / 8174, 2237-1521
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

নেত্রদান মহাদান

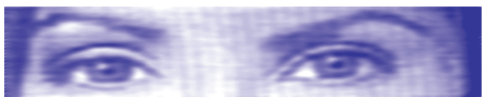

EYE BANK
23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451
অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387
সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

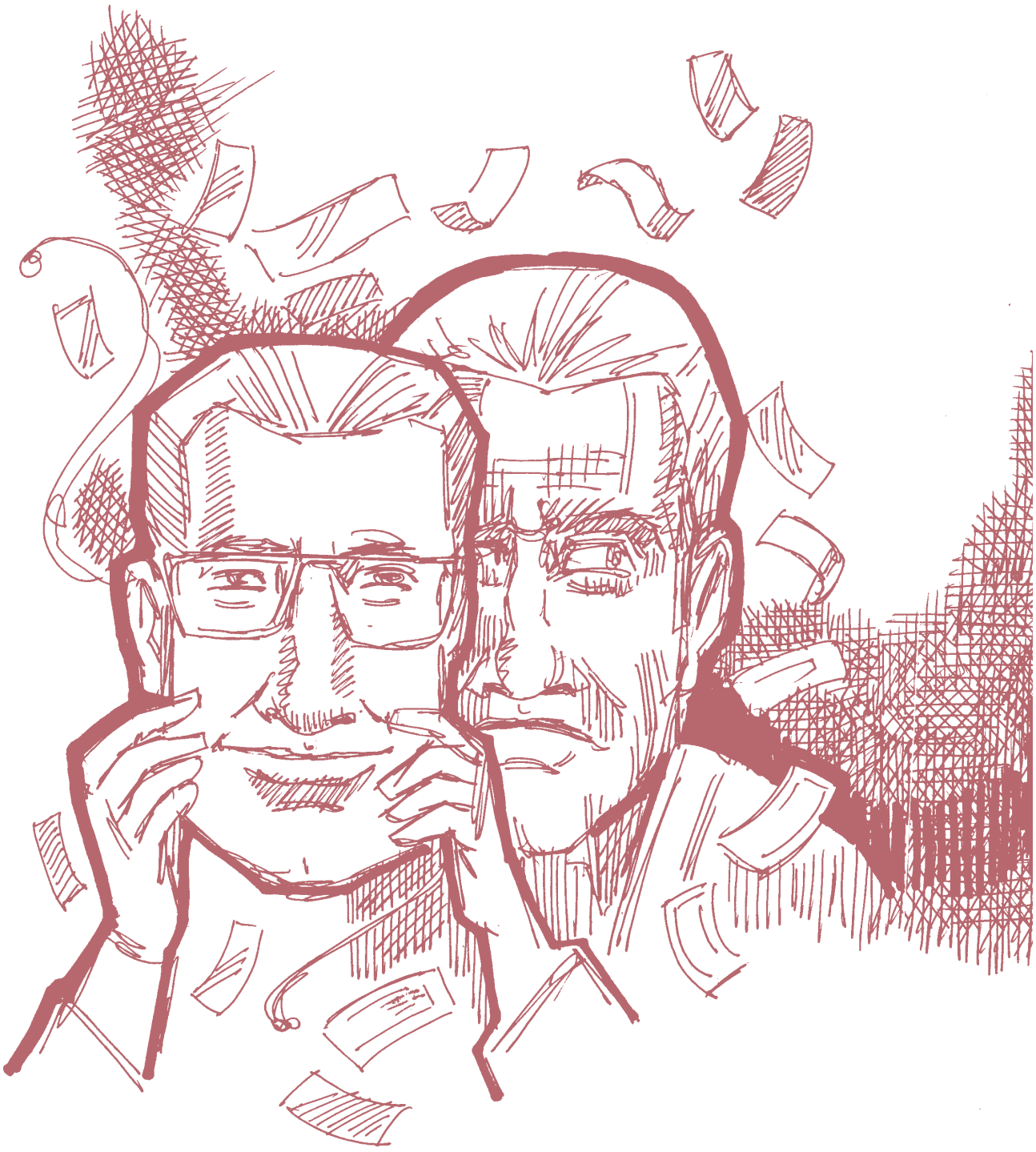

মুখের আড়ালে মুখ

সুমিত্রা ঘোষ

উপন্যাস

প্রকৃতির দু'হাত উজাড় করে দেওয়া নানা সম্পদে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলটার পুরনো নাম ছিল ছোটনাগপুর। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতবর্ষের মানচিত্র যে কতবার বদলে দেওয়া হয়েছে তার হিসেব এখন আর কেউ রাখে না। জাতি-ধর্মের বৈষম্যের দোহাই দিয়ে দেশ ভাগ করে স্বাধীনতার নামে যে রাজনৈতিক বিষবৃক্ষটি রোপণ করা হয়েছিল, সেটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে এমন এক বিকট আকার ধারণ করেছে যে একে উপড়ে ফেলার ক্ষমতা তো আর নেই-ই, ডালপালা ছেঁটে কিছুটা কমজোর করার সাহসও শাসককুলের কল্পনার অতীত। এদেশের জাতীয় ঐক্যের মৃত্যু তো '৪৭ সালেই ঘটে গিয়েছিল; তারপর থেকে তো ভাষাভিত্তিক, জাতিভিত্তিক, ধর্মভিত্তিক অনৈক্যই অনৈক্য। দু'হাত কাটা ভারতমাতার শরীরের সর্বাঙ্গে ছুরি চালিয়ে ছোট ছোট রাজ্যে কেটে ফেলা হয়েছে মাংসের পিসের মতো।

নিভা যখনই একা হবার সময় পান তখনই এসব কথাই ভাবেন। তাঁর ভাবনার কথা জানাবার, আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক করার মতো কেউ তাঁর পাশে নেই, তাই তাঁর প্রাণের গভীরে দেশাত্মবোধের যে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা ক্রমাগত প্রবাহিত হয়, সেকথা এই আদিবাসী অধ্যুষিত টিলাটাঙ্গর, জঙ্গলা ভূমির সহজ-সরল হতদরিদ্র মানুষগুলো জানে না। নিভাকে ওরা বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে, মাতৃরূপে প্রায় পুজোই করে, শুধু ওঁর ভাবনার নিভৃত জগৎটাতে প্রবেশের দুয়ার খুঁজে পায় না। আর, খুঁজে পেয়ে উঁকি মেরে দেখলেও বুঝতেই তো পারত না ওদের মা এসব কি আবোল-তাবোল চিন্তা করেন। চল্লিশ বছর আগে মা যেখান থেকে ওদের কাছে থাকতে এসেছিলেন, সেই 'কলিকেতা' শহরের নামটাও তো আঙ্গুলে গোনা দু-তিনজনই মাত্র শুনেছে। তাহলে ওরা আর কি করে বুঝবে মা ভাবেন— দেশে গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে পরিবারতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চলছে। মধ্যযুগীয় প্রথায় দেশটাকে অসংখ্য ছোট রাজ্যে বিভক্ত করা হয়েছে অযৌক্তিক দাবির সামনে মাথা নত করে। একটা রাজ্যের সঙ্গে আর একটা রাজ্য কোনও ব্যাপারেই সহমত হতে পারে না। আপন দলীয় স্বার্থচিন্তার ঊর্ধ্বে উঠে দেশের স্বার্থে সামান্য ত্যাগ স্বীকার করতেও এরা পিছিয়ে পড়ে কলহ-বিতর্কে লিপ্ত হয়। চারদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত দেশের সীমান্ত বারবার লঙ্ঘিত হলেও ভুয়ো গণতান্ত্রিক দেশের ততোধিক ভ্রষ্ট রাজ্যগুলো সেই মধ্যযুগের আগ্রাসনকামী অনুপ্রবেশের সময়ের নৃপতিদের মতো 'যাক শত্রু পরে পরে' ভেবে নিজের গদি বাঁচাতে 'রা'টিও কাড়ে না। আর, বাদশাহী দিল্লীর মসনদ আঁকড়ে বসে থাকা মেরুদণ্ডহীন পরিবারশাহীর সব সদস্যরা পড়ে পাওয়া ষোলোআনা বিলাসবহুল রাজকীয় জীবনযাত্রা বাঁচানোর প্রবল তাগিদে ভোটাশীর্বাদের কামনায় দলিত জাতির কুঁড়েঘরের মেঝেতে বসে 'খানাখাজানা'র রেসিপি খেয়ে অপূর্ব নাট্যাভিনয় দেখিয়ে দেশবাসীর চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করে। — তা, নিভামাতাজীর এহেন ভাবনা-চিন্তার মূল্যায়ন এরা কেমন করে করবে? তবে হ্যাঁ, নিজের জান দিয়েও ওরা নিভা মাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে। কারণ, গত চল্লিশ বছরে ওরা বুঝেছে নিভা মা ওদের আত্মীয়, ওদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আপনজন।

নিভা কি এমনি করেই দেশের কথা, দশের কথা সবসময় ভেবেছেন? না। উনি যখন তরুণী ছিলেন তখন কলেজে পড়া আর পাঁচটা মেয়ের মতোই পড়াশুনোর পাশাপাশি আড্ডা মেরেছেন, নাটক-সিনেমা দেখেছেন, তারুণ্যের রোদের কমনীয় তাপ গায়ে মেখেছেন। রাজনীতি, বিপ্লব এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর মানসিকতাই ছিল না তাঁর। নিজের বাড়িতে বাবা, মামা, মামাতো ভাই নিজেদের রাজনীতির স্রোতে ভাসিয়েছে— দেখেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের মধ্যে এ বিষয়ে তেমন সচেতনতা ছিল না তখন। উদ্বাস্তু কলোনীর টিনের চাল আর ছিটেবেড়ার ঘরে হতশ্রী দারিদ্র্যের সঙ্গে বসবাস করে কেটেছে শৈশব-যৌবনের অনেকগুলো বছর। তবুও বাবা, মামা, ভাইয়ের মতো বিপ্লবের বানে ভাসার ইচ্ছেই জাগেনি ওঁর। কলেজের অনেক সহপাঠিনীরা নানা দলের মতাদর্শে বিশ্বাস করে, এককথায় পার্টি করত। কিন্তু নিভা করেননি। নিভা একটা সাধারণ মেয়ের মতো বাঁচতে চেয়েছিলেন, বিশেষ কেউ হতে চাননি। কথায় বলে— ম্যান প্রপোজেস গড্ ডিসপোজেস— ঠিক তাই তো ঘটেছিল নিভা নামের সাধারণ মেয়েটার জীবনে! ওঁরই মতো হতদরিদ্র এক বিধবা, উদ্বাস্তু মায়ের সূর্যের মতো প্রখর মেধাবী একমাত্র ছেলের কালো মুখে গভীর কালো দুটো চোখের হ্রদে ডুবেছিলেন, আর ভেসে ওঠেননি। সেই কালো ছেলের আগাগোড়া সত্য, নিষ্ঠা আর আদর্শে মোড়ানো ছিল। নিজেকে, নিজের আইডিওলজিকে সে হাতের পাতার মতো চিনত। ৬০-এর দশক থেকে ৭০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গে নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে শোষক এবং শোষিত সম্পর্কের বিরুদ্ধে যে বিপ্লব ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল সে সেই বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাসী ছিল। সেই নিভাকে অশেষ যত্নে দেশের কথা, দশের কথা ভাবতে শিখিয়েছিল। সে অনেক আগেই চলে গেছে তাঁর জীবন থেকে। যাবার আগে নিভার চেতনার মধ্যে প্রোথিত করে দিয়ে গেছে নিজের আদর্শের বীজ। আর, নিভা সেই আদর্শের বীজটুকু নিয়ে জীবনের চল্লিশটা বছর একটানা কাটিয়ে দিচ্ছেন ঝাড়খণ্ডের এই আদিবাসী গ্রামে। বিশ্বায়ন আর পশ্চিমী সভ্যতার পেছনে দুরন্তগতিতে ছুটতে থাকা কোলকাতা আর তাঁকে আকর্ষণ করে না। কানু সান্যাল নতুন পার্টি তৈরি করলেন সি পি আই, (এম এল) যারা চীনের মুক্তিকামী নেতা মাও সে তুঙ-এর আদর্শে দীক্ষিত হলো। নিখিল সেই দলে ছিল। নিভা কখনও কিন্তু এই

গ্রামে মাও সে তুঙ-এর নাম উচ্চারণ করেননি।

— 'জানো, বাবার শরীর কিন্তু ভাল যাচ্ছে না। খিট্‌খিট্ করে কাজের লোকদের মাথা খারাপ করে দিচ্ছেন। তাছাড়া, আপনমনে একা একা কি যে বলে চলেছেন পূর্ববঙ্গের ভাষায় বুঝতেও পারি না। কাল বের হবার আগে একবার বাবার সঙ্গে দেখা করে যেও না! কতদিন হলো তিনতলায় ওঠোনি বলত?'

সমু ওরফে সমীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এম পি, কলকাতায় এলে সারাদিনে স্ত্রীর সঙ্গে সাংসারিক কথাবার্তা বলার সময় রাত এগারোটার পর। সকালে ব্রেকফাস্টের সময় স্ত্রী টেবিলে বসেন যদিও, কিন্তু ব্যক্তিগত কথা বলার উপায়ই থাকে না। ফোনের পর ফোন এ্যাটেন্ড করতে করতে, আমলা-চ্যালাদের কথা শুনতে শুনতে, এগিয়ে ধরা কাগজপত্রে চোখ বুলিয়ে সই করতে করতে সমীন্দ্রনাথ ব্রেকফাস্ট সেরে নেন। তুখোড় বুদ্ধি এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতা সমীন্দ্রনাথের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, এটা রাজনৈতিক মহলেও পশ্চিমবাংলা থেকে দিল্লি অবধি মোটামুটি সকলেই জানেন। একথাও সকলেই জানেন যে, অসাধারণ রাজনৈতিক মেধাসম্পন্ন এই ব্যক্তি নিজেকে ছাড়া আর কারও বিশেষ ধার ধারেন না এবং মতের অমিল হলে যখন তখন ইস্তফা দিয়ে দলত্যাগ করতে পারেন। ভারতীয় রাজনীতিতে সমীন্দ্রনাথ এক অমূল্য রত্ন, দল তাকে ত্যাগ করতে ভয় পায়। কারণ মানুষ এই লোকটিকে পছন্দ করে তার কর্মদক্ষতার জন্য। নিজের কন্সটিটুয়েন্সির সঙ্গে কখনও সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেন না, যে কোনও কেউ যে কোনও সময় (রাত এগারোটার মধ্যে), যে কোনও অভিযোগ বা দাবি নিয়ে তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারেন, উনি কাউকে ফিরিয়ে দেন না। যথাসম্ভব সাহায্য করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। কখনও ভুলে যান না এদের ভোটে ইলেকশন জিতে এম পি হচ্ছেন, মন্ত্রী হচ্ছেন। যখন যেখান থেকে জিতেছেন (হারেননি কখনও) সেই জায়গার ভোল পাল্টে দিয়েছেন, মানুষের সেবা করেছেন, বেকারদের কোনও না কোনও ব্যবস্থা করে স্বাবলম্বী করেছেন। অতএব, এমন একটি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সকল দলের নিকট লোভনীয় পণ্য হতে বাধ্য। আর তাই সমীন্দ্রনাথের বাজার দর সবচেয়ে বেশি। একদল ছেড়ে অন্য দলে যাবার জন্য অন্য কেউ যখন পাঁচ কোটিতে বিক্রি হন, সমীন্দ্রনাথ তখন পনেরো-কুড়িতে নিজেকে বিক্রি করেন। কেনই বা করবেন না? তার জনপ্রিয়তা প্রবাদতুল্য, তার পেছনে জনতার শক্তি!

স্ত্রীর অভিযোগ সমীন্দ্রনাথের কানে গেছে। রোজ রাতের নিয়মিত বরাদ্দ দু-পেগ হুইস্কির প্রথম পেগটা শেষ হয়েছে। গ্লাসে দ্বিতীয় পেগ নিয়ে বলেন— 'নব্বুই বছর বোধহয় পার করে ফেলেছে বাবা। এখন ওরকম করবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ... কাজের লোকদের মাইনেপত্র ঠিকমত দিচ্ছ না নাকি? ওদের মাথা খারাপ কেন হবে? বাবার দেখাশুনো করাই তো ওদের কাজ। খিটখিট করুক কি বকবক করুক ওদের সেটা মেনে নিতে হবে, কারণ, একজন বৃদ্ধের কাছ থেকে বাংলা ব্যান্ড শোনার আশা করতে পারে না ওরা; খিটখিটই শুনতে হবে। এটাই ওদের কাজের অঙ্গ।'

— 'সে না হয় হলো। কিন্তু বাবার তো আর মাথা খারাপ নয়? সব জানেন সব বোঝেন। দোতলা থেকে তিনতলায় গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা কর না সেটা কি ঠিক? বাবার মনে হয়ত কষ্ট হয়! কাল কিন্তু একটু সময় নিয়ে বসো।'

— 'সময় কোথায় পাই? সময় যাবো কাল। ..... আর ক'টা স্ন্যাক্স এনে দাও তো।'

চিত্রা চিকেন টিক্কা আনতে উঠে পড়েন। তার স্বামীর অনেক নাম-যশ, অনেক গুণ। ভীতুও নন তিনি বরং দুঃসাহসী বলেই জানেন চিত্রা। শুধু এত এত বছর ঘর করেও বুঝতে পারলেন না সমীন্দ্র বাবার মুখোমুখি হতে কেন চান না? আর, বাবাই বা নিজের এমন কৃতী একমাত্র ছেলেকে রেগে গেলে কেন কুলাঙ্গার বলে গালাগাল করেন? চিত্রার তখন খুব খারাপ লাগে। বিয়ের আগে শ্বশুর নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী চিত্রার বাবাকে বলেছিলেন— পূর্ববঙ্গ ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে আসার সময় থেকে তিনি তাঁর দিদি-জামাইবাবু করুণাময় ভট্টাচার্যের সঙ্গে এক বাড়িতে , এক হাঁড়িতে, এক পরিবার হয়ে থাকেন এবং কোনও অবস্থাতেই এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হবে না। আমরণ দিদি-জামাইবাবু, নৃপেন্দ্রনাথ এবং তাঁর স্ত্রী-পুত্র একসঙ্গে থাকবেন। এতে যদি কন্যা এবং কন্যার মা-বাবা সম্মত হোন তাহলে এখানে বৈবাহিক সম্পর্ক হবে। নৃপেন্দ্রনাথ তাঁদের যৌথ পরিবারের আদ্যপান্ত ইতিহাস চিত্রার বাবা-মাকে বলেছিলেন। সব শুনে চিত্রার বাবা অভিভূত হয়ে সমীন্দ্রনাথের মতো এক উঠতি নেতার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হয়েছিলেন। বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার, মেয়েকে বলেছিলেন— এর থেকে সোনার সংসার মেয়ের জন্য আর কোথাও খুঁজে পাবেন না তিনি। পিসেশ্বশুর-পিসি শাশুড়ি এবং নিজের শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে ঘর করতে এসে চিত্রা উপলব্ধি করেছিলেন তার বাবা ভুল করেননি। চিত্রাও এই অদ্ভুত যৌথ পরিবারের উপযুক্ত বৌমা হতে এতটুকুও দেরি করেননি। স্বামী সমীন্দ্রনাথ ওরফে সমুও স্ত্রীকে ভালবাসা, মর্যাদা ইত্যাদি দিতে কোনওরকম কার্পণ্য করেননি কখনও যার ফলে চিত্রার স্কুলমাস্টার বাবার দেওয়া উপমা 'সোনার সংসার' চিত্রার আগমনের পর থেকে আরও শান্তি আরও সুখের হয়ে উঠতে পেরেছিল। এমন আদর্শবান

SATYANARAYAN ACADEMY

(A unique residential coeducational English Medium Secondary School)

Affiliated to CBSE (New Delhi - 2000)

Monthly Charge Rs. 3000/- Onwards with Fooding & Tuition etc. Girl will get 50% concession in tuition fee

Kolkata Address : 7B, Kiran Sankar Roy Road, 4th Floor, Kolkata - 700 001

For Further insertion contact - 9433175048 (M)

আসবাব

বর্ধমান

(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

ALWAYS EXCLUSIVE

Vandana SAREES

Cotton Printed Sarees

Contact - 22188744/1386

গহনা যদি গড়াতে চান

যে কোনও স্বর্ণকারকে

সুপার

ক্যাটলগ দেখাতে বলুন

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাক এণ্ড সন্স

১৫-ডি, গরাণহাটা স্ট্রীট, কলি-৬

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়,

রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয়!

অক্ষয় কুমার পালের

ফোল্ডিং ছাতা

বড়বাজার,কলকাতা-৭০০ ০০৭,

ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

Steelam

EXCLUSIVE FURNITURE

স্টীলম ত্রর .....

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে

Exclusive Show Room

দেওয়া হইবে॥

Factory :- 9732562101

পরিবারের বৌ হতে পেরে চিত্রা নিজেকে ধন্য মনে করতেন। কিন্তু শ্বশুর আর পুত্রের মাঝখানে কোথায় যেন একচিলতে নীতিগত ফাঁক রয়েছে সেটা বুঝলেও কারণ বুঝতে পারেননি কোনওদিন, তাই সেই ফাঁক ভরাট করে উঠতে পারেননি চিত্রা। এটাকে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয় বলে মনে করেন, আর দু'দিকের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় হিমসিম খাচ্ছেন এখনও।

মাপা ডোজের মদ্যপানের পর স্ত্রীর সঙ্গে বসে রাতের খাওয়া শেষ করে শুতে আসতে আসতে রাত বারোটা বাজে রোজ, এটাই সমীন্দ্রনাথের নিয়ম। তাই বলে সকালে ওঠার সময়টা পাল্টে যায় না দেরি করে। ঘড়ির কাঁটার মতো রুটিনে বাঁধা জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্ত। ঠিক সকাল ছ'টায় সমীন্দ্রনাথ যখন শয্যা ছেড়ে উঠে পড়েন, চিত্রা তখনও ঘুমোন। সমীন্দ্রর ছ'ঘন্টার মাপা ঘুমে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না সচরাচর। কিন্তু আজ রাতে বালিশে মাথা রাখামাত্র ঘুম তার চোখে চলে এলো না সঙ্গে সঙ্গে। নিদ্রার পরিবর্তে অনেক অনেক দূরে ফেলে আসা দুঃসহ অতীত আক্রমণ করে বসল তাঁকে। পাশে শোওয়া চিত্রা পড়তে না পড়তেই ঘুমিয়ে কাদা। সমীন্দ্র এপাশ ওপাশ করেন, কিন্তু ঘুম আসে না। বাবার সামনে যেতে তাঁর বড় অস্বস্তি হয়। এত বয়সেও বাবার চোখের দৃষ্টি যে কি সাংঘাতিক অন্তর্ভেদী.. সমু একেবারেই সইতে পারেন না। খুব ছোটবেলার কথা তাঁর বিশেষ মনে নেই, কেবল বেড়ার ঘর টালির চাল আর কিৎকিৎ খেলার কথা মনে পড়ে। তিনি পিসিমণির বারণ অমান্য করেও বস্তির অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে যেতেন, কিন্তু দিদিভাই যেতে পারত না। আবাল্যের সঙ্গী দিদিভাই পিসিমণি-পিসেমশাইয়ের একমাত্র মেয়ে। অনেক কাল পরে আজ নির্ঘুম রাতে দিদিভাইয়ের কথা মনে পড়তেই ডাকসাইটে এম পি সমীন্দ্রনাথ ওরফে সমুর হৃদ্‌পিণ্ড চিরে বিদ্যুৎ ঝলকে ওঠে। এক পরিবারে থেকে রিলিফের দুর্গন্ধযুক্ত মোটা চালের ভাত এক থালায় খেয়ে বড় হওয়া মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোন ছোটবেলায় বুঝতেই পারেননি যে ওরা আপন ভাইবোন নন। বড় হয়ে স্কুল-কলেজে পড়ার সময়ও কি কখনও মনে হয়েছে ওদের যে ওরা আলাদা দুই মায়ের গর্ভজাত সন্তান? ...দিদিভাই কেমন আছে? বেঁচে আছে জানি, কিন্তু কতকাল আসে না। সল্টলেকের এই প্রাসাদোপম বাড়িটা তো দেখেইনি ও। কোলকাতা ছেড়ে যাবার পর মাত্র তিনবার এসেছিল দমদমের বাড়িতে। প্রাণাধিক প্রিয় ভাই সমুর বিয়েতে আসবে না ভাবেনি কেউ। তিনবারই পিসেমশাই, পিসিমা আর মা'র মৃত্যুশোকের সাথী হতে এসেছিল সে। সমীন্দ্রনাথ অনেক করে বলেছিলেন— 'আর ঐ জঙ্গলে ফিরে যাস না দিদিভাই। এখানেই থেকে যা।' থাকতে চায়নি ও। নানা ছুতো দেখিয়েছে। আর বাবাও ওকেই সমর্থন করেছে। কঠোর কণ্ঠে তেজ দেখিয়ে বলেছে— 'না নিভা। সমুর আবদারে কান দিস না। তুই যেখানে আছিস শান্তিতে আছিস। সম্মানিত, আদরণীয় হয়েই আছিস। ফিরে যা মা। এই লাক্ষার ঘরে তোকে থাকতে হবে না। তুই মানুষের সঙ্গে আছিস তাদের কাছেই ফিরে যাবি। এ আমার আদেশ।' অসহ্য লাগে বাবার এই সমস্ত কথা! সকালে দেখা-টেখা করতে যাবেন না। চিত্রা যতই বলুক। বাবার প্রতি একমাত্র পুত্রের কোন কর্তব্যটা উনি করেননি? বাঁধা ডাক্তার, যে ফোন পেলেই অন্য পেশেন্টদের বসিয়ে রেখে রাতবিরেতেও চলে আসে। দুটো ষণ্ডামার্কা লোক, যারা পার্শ্বচরের মতো ওঁর পাশে থাকে শুধু হুকুম তামিল করার জন্য। আর ওঁর আদরের বৌমা তো চব্বিশ ঘন্টা-অধিকন্তু নঃ দোষায় হয়ে রয়েইছে। সেবাযত্নের ত্রুটি তো হচ্ছে না! আমি গিয়ে সামনে দাঁড়ালে উনি তো খুশি হন না, বরং নিমতেতোর মতো মুখ বানিয়ে রাখেন। না, কাল সকালে আমার সময় হবে না তিনতলায় যাবার। দমদমের বস্তির ঘর জবরদখল সরকারি জমির ওপরে ছিল। অনেক পরে রাজ্য সরকার পাট্টা দিয়েছিল। তখন বেড়ার দেওয়াল টালির চাল ফেলে দিয়ে ভদ্রলোকের বাসের উপযোগী একখানা একতলা বাড়ি হয়েছিল। তখন

With Best Compliments From

:

MONOSKAMANA INDUSTRIES

Monoskamana Road. MALDA

ELECTRIC WELDING LATHE JOB AND MACHINARY REPAIRING WORKSHOP

Dealer

WOOD CRAFT, WORKSHOP, MACHINARY, LATHE, DRILL, SAW MILL

Manufacturer

CULTY, CAGEWHEEL - DYCINDICATOR, BULLOCK CART CHAKA

Phone : 264201(F) / 268840(R)

Anil Kr. Bhalotia

Property Consultant

689, Lake Town, Block - A

Kolkata -700089

(Near Hollywood Dry Cleaner)

Ph : 9330026410 (M)

9339364060 (R)

9230618818 (M)

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ—

— জনৈক শুভানুধ্যায়ী

সফল কেরিয়ার গড়তে

স্থায়ী আয়ের এক সুবর্ণ সুযোগ!!!

মাধ্যমিক পাশ যে কোন ব্যক্তি/গৃহবধূ/বেকার ভাই-বোন/কলেজ ছাত্র-ছাত্রীরা স্থায়ী আয়সহ জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

ভারত সরকারের ১নং অর্থনৈতিক সংস্থা **L.I.C.**-র অন্যতম **Chief Adviser**

সোমেক ব্যানার্জী — মোবাইল—৯৮৩০৪১১৬৩৫

আপনি জানেন কি??

L.I.C. তার এজেন্টদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে তা সাধারণ কোন সরকারী বা বেসরকারী চাকুরিজীবিদের থেকে অনেক বেশি।

L.I.C.-র এজেন্টদের সুযোগ-সুবিধার কিছু অংশ

- নির্দিষ্ট একটা আয়
- পেনশন
- টার্ম ইনসিওরেন্স (২ লক্ষ টাকা)
- গাড়ি/মোটর সাইকেল কেনার জন্য ঋণ (বিনা সুদের হারে)
- গ্রাচুইটি (২ লক্ষ টাকা)
- প্রতি বছর গ্যারান্টি বোনাস
- গৃহঋণ (নামমাত্র সুদের হারে)
- ছেলে-মেয়ের জন্মদিন বা বিবাহের জন্য অগ্রিম অর্থ।

"এজেন্সী প্রফেশন" জীবনের লক্ষ থাকে না, কিন্তু এই প্রফেশন জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করে।

দ্বিধা দ্বন্দ্ব জীবনে প্রতিষ্ঠার বড় বাধা।

দিদিভাই বড় হয়ে গেছে। শাড়ি পরে। চটের বস্তার আড়াল দেওয়া ক'টা ইঁট বসানো 'বাথরুম' নামক খোলা আকাশের নীচের জায়গাটাতে মা-পিসিমা স্নান করতে বাধ্য হয়েছেন, তাই বলে বড় হয়ে যাওয়া মেয়েকে ওখানে আর স্নান করতে দেওয়া যায় না। সেই পাকা একতলাকে বাবা পরে দোতলাও বানিয়েছিল। দিদিভাই আর আমার জন্য একটা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বড় চিলেকোঠা সম্বল। দিদিভাই শুধু দিদি ছিল না, আমার জীবনের অর্ধেক আকাশ জুড়ে ছিল আমার দিদি। একাধারে মা, বড়বোন আর বন্ধুর রোলে প্লে করত সে। ওই একখানা রুমে ওর সামনেই সিগারেট খেতাম, সেই যুগে যা গর্হিত কাজ বলে মনে করত লোকে। নিজের টিউশানির মাইনে থেকে একখানা এ্যাশট্রে কিনে এনে মা-পিসিমণির চোখের আড়ালে লুকিয়ে রাখত। তা, ওইরকম একতলা-দোতলা মিলিয়ে তিনখানা ঘর, একটা বাথরুম আর রান্নাঘর সম্বল। বাড়ি থেকে আমিই তো বাবাকে সল্টলেকের মতো জায়গায় তুলে এনেছি? তিনতলার পারমিশন নেই, নেহাৎ প্যাগোডা স্টাইল বাড়ি বলে অতবড় ছাদের মাঝখানে দুটো ঘর হয়েছে বাবার জন্য। অনাদর-অযত্ন করিনি কখনও, তবু শালা আমি নাকি ওই বামপন্থী আদর্শবাদী মানুষটার কাছে কুলাঙ্গার! বেশ। তাই সই। আমি চিত্রার প্যাঁচে পা দিয়ে কাল সকালে মোটেই যাচ্ছি না বাবার সামনে! সমীন্দ্র দড়াম করে পাশবালিশ শুদ্ধু পাশ ফিরে শোন, আর তখনই ঘুম নেমে আসে চোখে।

দেশ ছেড়ে আসার কোনও স্মৃতি নিভার মনে জমা নেই। তিনি নাকি তখন কাঁথায় জড়ানো একটা তুলতুলে পুঁটলী। বড়ো হতে হতে সারাক্ষণ মা'র বিলাপ শুনে শুনে জেনেছেন দেশের বাড়ির কথা, হোমিওপ্যাথ ডাক্তার হিসেবে বাবা করুণাময় ভট্টাচার্যের পসার, নামডাকের কথা। তাঁর স্মৃতিতে দমদমের বাঁশের বেড়ার ঘর আর পরে ছোট দোতলা বাড়িটাই বেশি সমুজ্জ্বল। নিভা দেশের বাড়ি, বড়ো উঠোন, পেছনে ছায়াশীতল পুকুর দেখেননি। স্বচ্ছলতার স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না, তাই কলোনীর মাটির মেঝের ঘরখানাতে আরশোলা আর বিচ্ছিরি কুনো ব্যাঙগুলোর সঙ্গে বাস করতে খারাপ লাগেনি কখনও। ছোটবেলায় বুঝতে না পারলেও বড়ো হয়ে বুঝেছিলেন মা-মামী দু'জনেই পেছনে ফেলে আসা পরিচয় ভুলতে না পেরে কষ্ট পান। একই গ্রাম থেকে একসঙ্গে আসা নিম্নবর্ণের কিছু পরিবার তাদের পাশেই থাকত। মা নিজে কখনও ওদের সঙ্গে মেলামেশা করত না, নিভাকেও ওদের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে দিতে চাইত না। নিভার শিশুমন খেলার জন্য ছটফট করত। বায়না ধরলেই মা রেগে আগুন হয়ে বলত— 'কপাল দোষে ওরা আর আমরা আইজ এক জায়গায় আছি বইল্লা কি এক হইয়া গেছি যে তুমি হেগো পোলাপানের লগে খেলতে যাইবা? জানো, দেশে থাকতে হেরা আমাগো ভিতরের বাড়িতে পা রাখে নাই কোনওদিন। তুমি ঘরে বইস্যা রান্নাঘর খেলা কর। আমি তরকারির খোসা-টোসা দিমু তুমারে। যাও।'

বাবা এসব শুনলেই ভয়ানক রেগে যেতেন মায়ের ওপর। বলতেন— ওদের আর আমাদের মধ্যে আজ আর কোনও তফাৎ নেই গীতা। বরং এখন ওরাই ভাল আছে আমাদের চেয়ে। ওরা দেশেও দিনমজুরী করে চালাতো, এখানে এসেও তাই চালাচ্ছে। কিন্তু আমার অবস্থা দেখ! না ডাক্তারী করতে পারছি, না তো দিনমজুরী করতে পারব। পেছনে যা ফেলে এসেছ সেদিকে তাকিয়ে হা-হুতাশ করা বন্ধ কর। ওদের আর আমাদের এখন একই পরিচয়— আমরা বাস্তুহারার দল। আপদে বিপদে ওরাই এখন আমাদের নিকট আত্মীয়, ওরাই সাহায্য করতে দৌড়ে আসে একথা ভুলে যাও কি করে? গীতা, বর্ণসংকট থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা কর। তাহলেই এই দুঃসহ অবস্থায় স্বস্তি পাবে। ... যা নিভা, তুই ওদের সঙ্গে খেলবি যা। আমি বলে দিচ্ছি তোকে, রোজ ওদের সঙ্গে খেলা করিস। তা না হলে বাঁচবি কি করে?

বর্ণগত দুর্ভেদ্য দেওয়ালটাকে বাবা সত্যিই ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। বিমল নাথ, দীনা পরামানিক, সুরেন দাস, লক্ষণ শুক্লবৈদ্যরা ঘরের ভেতর মাদুরে একাসনে বসে বাবা আর মামার সঙ্গে আলোচনা করত, একসাথে মিছিলে যেতো— দেখেছেন নিভা।

মা'র কাছে শুনেছিলেন বড়ো হবার পর— হিন্দুদ্রোহী দাঙ্গায় মুসলমানরা দাদু-দিদিমাকে নাকি কুপিয়ে মেরে ফেলেছিল। মা'র তখন সদ্য বিয়ে হয়েছে মাত্র। কয়েকমাস আগে। মামা ছোট ছিল তখন। দিদির বাড়ি যাবে বলে বায়না ধরে চলে এসেছিল দিদির শ্বশুরবাড়িতে। তাই দাঙ্গাবাজদের হাত থেকে মামার প্রাণটা বেঁচে গিয়েছিল। সেই থেকে মামা দিদি-জামাইবাবুর কাছে মানুষ হয়েছে। লেখাপড়া শিখে জুটমিলে সুপারভাইজারের চাকরি করেছে। দিদি-জামাইবাবুই যথাসময়ে মামার বিয়ে দিয়েছে। ওদের জীবনের ওপর দিয়ে অতশত ঝড় বয়ে যাওয়ার পরও এরা নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে আসতে চায়নি। নানা অত্যাচার, অপমান সহ্য করেও থেকে যেতে চেয়েছিল স্বভূমিতে। কিন্তু মুসলমানদের দেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি কারও সহানুভূতি নেই। ওই দেশটা ভারতবর্ষ নয় যে সংখ্যালঘু মুসলমানদের কোলে বসিয়ে দুধ-কলা খাইয়ে পাখার বাতাস করে নধরকান্তি করে তুলবে

একদিন ফণা তুলে ছোবল মারবার জন্য। করুণাময়ের পরিবার এবং ওই গ্রামের আর যেসব হিন্দু ছিল তাদেরকে ফতোয়া জারি করা হলো— এদেশে থাকতে হলে মুসলমান হও না হলে নিজেদের হিন্দুরাষ্ট্রে চলে যাও। তা না হলে চরম শাস্তি ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থেকো। এই ফতোয়া শুধু করুণাময়দের গ্রামে নয়, যেসব গ্রামে কিছু হিন্দু তখনও অবশিষ্ট ছিল, সেই সব গ্রামগুলোতেই জারি করা হলো। তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে প্রত্যেকদিন একবার করে বাড়িতে এসে শাসিয়ে যেতে লাগল। সকলে বুঝল আর জন্মভিটের মায়ায় দেশে পড়ে থাকা যাবে না। বিদেশের জমিতে উদ্বাস্তুর পরিচয় নিয়ে চলে যেতেই হবে। তা না হলে রামদাঁ দিয়ে কচুকাটা করে রেখে দিয়ে সম্পত্তি দখল করবে ওই দানবরা।

— 'জানিস, এদেশে আসার পর ক্যাম্পে-ক্যাম্পে থেকেই তুই হাঁটতে, কথা বলতে শিখে গেলি। কি দুঃসহ জীবন! তারপর, সহ্যের সীমা পার হতে মানুষরা মাঠে-জঙ্গলে, রেল লাইনের ধারে একটা চালাঘর বানিয়ে জমি দখল করে নিতে শুরু করল। সেই ৪৬-৪৭ সালে আমাদের আসার অনেক আগে স্রোতের মতো যারা এসেছিল, তারা এভাবেই জমি দখল করে পথ দেখিয়ে রেখেছিল। দেশটা তো আর দেশের লোকের ইচ্ছেতে ভাগ হয়নি? যারা নিজেদের স্বার্থে ভাগ করে কয়েক কোটি মানুষকে ভিখারী করেছে, তারা এবার বুঝুক! তুই বিশ্বাস করবি না, নিভা সে জমি দখলের সময় অন্য সকলের সঙ্গে একজোট হয়ে তোর বাবা আর মামার সে কি মারমূর্তি?'

এভাবেই মা প্রায়ই এইসব গল্পের টুকরো বলে বলে নিভার মনে মা-বাবা, মামা-মামীর জীবনের যন্ত্রণাময় অধ্যায়ের করুণ ছবি এঁকে দিত। শোনা কথার রংয়ে আঁকা সেই ছবিগুলো নিভা মনের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছেন। মনে পড়ে বাড়ির একটি লোকও কোলকাতার ভাষায় কথা বলত না বাড়িতে। নিভাও না। এখন মনে হয়, সবকিছু হারিয়ে এসে নিঃস্ব মানুষগুলো যেন নিজেদের মৌখিক ভাষাটুকুর মধ্যে অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করত। বাবার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা জমেনি এই অত্যাধুনিক শহরে। মা আর মামীর গয়না বিক্রির টাকায় টিপে টিপে সংসার চালাতো মা। জুটমিলের চাকরিতে মামার যোগ্যতা, অভিজ্ঞতাও কোনও কাজে আসছিল না। কর্পোরেশনের বিনা বেতনের প্রাথমিক স্কুলে পড়তে যেতেন নিভা। আর বাবা-মামা কংগ্রেসের প্রতি বিতৃষ্ণায় কমিউনিস্ট পার্টির মিটিংয়ে লাল পতাকা হাতে মিছিল করে যেতেন বেঁচে থাকার পথ খুঁজে পাবার আশায়। এরকম একটা পরিস্থিতির সময়ে অবশেষে মামা কারও সুপারিশের জোরে এখানে একটা জুটমিলে চাকরি পেয়ে গেল। অনেক বছরের নিষ্ফলা খরার পর বৃষ্টি এলো পরিবারে। দু-মুঠো ভাতের চিন্তা শেষ। বয়স কম হলেও দারিদ্র্যের চাপে পড়ে নিভাও অনেক কিছুই বুঝতে শিখে গেছেন তখন। মামার চাকরির আনন্দের মধ্যে নিজ কিছু করতে না পারার হতাশা আর গ্লানিতে অপরাধী বাবা কেঁদে ভাসিয়ে ছিলেন শ্যালক নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সামনে— 'নিপু, আমার মতো অপদার্থের বাইচ্যা থাকাই উচিত না রে! এতকাল বাড়ির বৌগো গয়না বিক্রির টাকায় খাইছি, এই জীবনে আর কোনওদিন হেগো গয়না একখানও ফিরাইয়্যা দিতে পারম না। আর অখন পুত্রসম তোর রোজগারে ভাগ বসাইয়্যা খাইতে হইব। ইয়ার থাইক্যা লজ্জার আর কি হইতে পারে, ক? পরিবারের কর্তা আমি, আমার এক পয়সা রোজগার নাই। তোর ঘাড়ে চাইপ্যা পরিবার চলব এইডা ভাবতেও আমার কষ্ট হইতাছে রে! এই বোঝা টানলে যে তোর নিজের ভবিষ্যৎ বইল্লা আর কিছু তৈরি হইব না নিপু!' নৃপেন্দ্রনাথ আশ্চর্য গলায় বলেছিলেন— এইসব আপনে কি ক'ন জামাইবাবু? দিদি আর আপনে ছাড়া আমার আর কে আছে? আমারে আইজ এই নৃপেন্দ্র চক্রবর্তীকে বানাইছে ক'ন দেহি? পুত্রসম কইতে পারেন আর পুত্রের রোজগার নির্ভর করতে নিজেরে বোঝা বইল্লা মনে করতাছেন?' — আহত গলায় মামা বলেছিল— 'আপনে কি আমারে পর কইর‍্যা দিতে চান জামাইবাবু? হেইয়া তো কখনওই হইব না। আমি বাইচ্যা থাকতে এই পরিবার কোনওদিন ভিন্ন হইব না, এই কথা কইয়্যা দিলাম।'

মামার ছেলে সমীন্দ্রনাথের তখন প্রথম স্কুলে যাবার বয়স। সেই সমুটা পরপর তিনবার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে আর প্রত্যেকবারই গর্ব করার মতো মার্জিনে জিতেছে। ভাই ছোটবেলায় বাবাদের দলের পোস্টার লিখত, দেওয়ালে সাঁটাতো। ওর মধ্যে রাজনীতি চেতনা স্কুলের ওপরের ক্লাশে পড়ার সময় থেকেই জেগেছিল, নিভা জানতেন। তিনি নিজে পলিটিক্সের 'প' বুঝতেন না, বোঝার আগ্রহই ছিল না। কিন্তু সমু বুঝত। এখন মনে হয় রাজনীতি যেন ওর রক্তের মধ্যে ছিল। মামা-বাবারা জীবনসংগ্রামে বিধ্বস্ত হতে হতে মিটিং মিছিলে যাওয়া ছাড়া পুরোদমে রাজনীতি করার সুযোগই পায়নি। সমু বড় হতে হতে সাংসারিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল প্রথম মামার চাকরী পাওয়াতে, পরে বাবার হোমিওপ্যাথির পেশাও মোটামুটি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বলেই ভাইকে সংসারের চিন্তা করতে বাধ্য হতে হয়নি। তাই সর্বক্ষণের জন্য নিজের ভাললাগা বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পেরেছে। মামা জুট মিলের ট্রেড ইউনিয়নের বেশি এগোতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু রক্তে রাজনীতি তো ছিল! ভাই সেটাকে এতদূর অবধি টেনে নিয়ে যেতে পেরেছে, ভাবতেও ভাল লাগে। দমদমে একতলার ছাদের ওপর মাত্র একখানাই ঘর ওদের দুই ভাই-বোনের জন্য তৈরি হচ্ছে শুনে ওরা দু'জনে যত খুশি হয়েছিল, সেরকম খুশি বোধহয় অন্য কোনও মূল্যবান

জিনিস পেলে হতো না। দু'দিকের দেওয়াল ঘেঁষে দু'খানা সস্তার তক্তপোষ আর পড়ার টেবিল আর একখানা আলনা। ব্যাস্, এইটুকু নিয়েই ওদের স্বাধীন নিজস্ব জগৎ পেয়েছিল ওরা। ক্লাশ নাইনেই সমুটা সিগারেট খাওয়া ধরেছিল আর ওকে শাসন করার জন্য নিভার কাছে সেটাই ছিল একমাত্র অস্ত্র। অস্ত্রটা ব্যবহার করেননি কখনও, শুধু ভয় দেখাতেন। ভাইও জানত, অন্তপ্রাণ দিদিভাই কখনোই গুরুজনদের কাছে নালিশ করে ছোট ভাইটাকে বিপদে ফেলবে না। নিভা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ-র প্রথম বর্ষ আর সমু মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। নিভা বলেছিলেন— 'এ্যাই তোর যতদিন পরীক্ষার পড়া ছিল আমি তখন রোজ ঝাড়ু-মোছা, বিছানা তোলা করেছি। এখন তোর পড়াশুনা নেই, তাই তুই ওগুলো করবি। আমি পড়লে পড়ব, না পড়লেও করব না বুঝলি?'— নিভা ভেবেছিলেন সমু খ্যাক্ করে প্রতিবাদ করে বলবে— 'ছেলেরা ঝাড়ু মোছা করে না চাঁদু! ওগুলো তোরই কাজ, তুই করবি বুঝলি?' — কিন্তু তা হলো না।

সমু বলল— 'অবশ্যই করব। তুই আমাকে অপদার্থ মনে করিস নাকি? মেয়ে বলে এসব কাজ তুই একা করবি, আর আমি ছেলে বলে পরিষ্কার ঘরখানা ব্যবহার করব, এ তো অন্যায় দিদিভাই!'

নিভা অবাক হয়ে বলেছিলেন— 'ও বাবাঃ! তুই কবে থেকে অমন জ্ঞানবৃক্ষ হয়ে গেলি ভাই? নিজের কানকে যে বিশ্বাস করতে পারছি না! সিগারেটের সঙ্গে সঙ্গে গাঁজা ভাং ধরে ফেলিসনি তো?'

মুখখানা গম্ভীর করে সমু বলেছিল— 'মোটেই না। নৈতিক অনৈতিক বলে কথা আছে তো? তুই এখন ইউনিভার্সিটিতে এম এ হতে যাচ্ছিস বলে কথা। এই অবস্থায় মেয়েদের অনেক সাবধানে রাখতে হয় বলে শুনি। ভাই হয়ে দিদিকে সাবধানে রাখার নৈতিক দায় আমার নেই নাকি?'

নিভা ওর কথা বুঝতে না পেরে বলেছিলেন— 'এম এ পড়ার সঙ্গে এসব কথার কি অর্থ তাই তো বুঝলাম না।'

— 'তুই না সত্যিই একটা হাঁদা। আরে এম এ মানে তো 'মা'— নাকি? তুই একবছর আগে বি এ মানে বিয়ে করলি, আর দু'বছর পর এম এ মানে মা হবি! ঠিক কিনা?'

তারপরের চুলোচুলি মারামারি চেঁচামেচি শুনে মামী দৌড়ে এসেছিল একতলা থেকে। কেন মারামারি সে কথা নিভা বলেনি মামীকে। ওদের ভাইবোনের পারস্পরিক গোপনীয়তা কেউ কখনও বড়দের কাছে ফাঁস করত না। ভাইটা যে ডেঁপো হয়েছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি, তবে এই বয়সে এই ডেঁপোমিগুলো স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে। নিভার এম এ পরীক্ষার পর ভাই একদিন জিজ্ঞেস করল— 'এবার তুই কি করবি? গবেষণা? ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের তুলনা টুলনা করে লিখে ফেল্ পেপার।'

— 'ওসব কিছু না। একটা চাকরি খুঁজব বাবা আর মামার পাশে দাঁড়ানোর জন্য। তোকে দিয়ে কোনও আশা নেই সে আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। তাই আমাকেই ওদের পাশে দাঁড়াতে হবে। ওদের তো বয়স বাড়ছে!'

— 'কি বললি? আমাকে দিয়ে আশা নেই? তোর এই কথাটা কিন্তু থুথু ফেলে থুথু চেটে তোলার মতো একদিন ফেরৎ নিতে হবে, দেখে নিস্। তুই চাকরি করে ক'দিন পিসেমশাই আর বাবার পাশে থাকবি রে! ধিঙ্গি মেয়েকে ওরা ঘরে রাখবে ভেবেছিস? বিয়ে দিয়ে বিদেয় করে দেবে, বুঝলি? এই শর্মাই পাশে থাকবে।'

নিভা মুখ ভেংচে বলেন— 'সে আমার খুব জানা আছে। এই বয়স থেকেই তো ক্যাডার হয়ে পার্টি অফিসে যত রাজ্যের বয়স্ক লোকগুলোর সঙ্গে পড়ে থাকিস! লেখাপড়ায় মন নেই, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে যাস। আমি মামাকে কিছু বলি না বলে ভেবে নিয়েছিস কখনও বলব না। আজ থেকে সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যে এসে পড়তে বসবি। না হলে কিন্তু বলে দেব।'

— 'যা, বলে দে গিয়ে। শোন দিদিভাই, আমি আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে নিয়েছি। আমি কোনও রকমে বি কম পাশ করব, ব্যাস! দিগ্‌গজ পণ্ডিত হবার কোনও বাসনা আমার নেই। তারপর ফুলফ্লেজড্ রাজনীতিতে ঢুকে পড়ব। চাকরি করে ক'পয়সা কামায় লোকে বল? নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। এই জমানায় টাকা কামাবার দুটো মাত্রা রাস্তা আছে। হয় একগাদা পয়সা খরচ করে ব্যবসা পত্তন কর আর নয় এক পয়সাও খরচ না করে রাজনীতিতে নেমে পড়। দ্যাখ, আমাদের ক্যাপিটেল নেই, তাই ব্যবসা হবে না, বিনা ক্যাপিটেলে পলিটিক্সের রাস্তায় লেগে থাকতে পারলে তবুও কিছু হবে। বারবার দল বদল করে করে সব দলের অন্তর্নিহিত ঘাঁত-ঘোঁত জেনে নিয়ে, নিজের কিছু সমর্থক তৈরি করে দাম বাড়াও। তখন দেখবে সব দলই তোমার মতো করিৎকর্মা ছেলেকে দলে পেতে চায়। শরীরের ঘাম ঝরিয়ে কাজ করে একবার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারলেই ওপরে ওঠার সিঁড়িগুলো নিজেরাই এগিয়ে আসবে। তারপর মওকা বুঝে ইলেকশনে টিকিট চাও। ... তার জন্য অবশ্য অনেক মূল্য দিতে হয়। যাদের টাকা আছে তারা টাকার মূল্যে টিকিট পায়। আর যাদের টাকা নেই, তারা অন্যভাবে মূল্য দেয়। একবার জিতে আসতে পারলে তো পাঁচ বছরের জন্য লুটেপুটে নেবার সুযোগ! পার্টি অফিসে নেতাদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেষি করলে ওদের গা থেকে গোপন টাকার গন্ধ বের হয় রে দিদিভাই।'

নিভা ভাইয়ের কথা শুনে থ্ মেরে গিয়েছিলেন। এ কোন সমুকে দেখছেন উনি? রাজনীতি মানে শুধু টাকা কামানো?

TODI HONDA

225C, A.J.C. Bose Road, Minto Park, Kolkata-700 020

Phone : 2302-5186/7, Fax : 2287-6329, Mob. 9831447735, email : todihonda@vsnl.net

ORIENT ENTERPRISES

BULK TRANSPORTERS

Business for warding & commission agents for bulk liquid transporation

225D, Acharya Jagadish Chandra Bose Road

1st Floor, Kolkata - 700 020

Phone : 2280-9036 / 37 / 38

Direct : 033-23025110 / 210 / 116

Fax : 033-2287-6329

E-mail : scdtodi@scdtodi.com

scdtodi@vsnl.com

আদর্শ বলে কিছু থাকবে না? আদর্শহীন, বিশ্বাসহীন দলবদলের নীতি গ্রহণ করে শুধু টাকা কামানোর জন্য সমু রাজনীতিকে পেশা করবে? বাবা-মামারা তো নিজেরা নেতা হবেন বলে মিছিলে যেতেন না। একটা আদর্শকে বিশ্বাস করতেন বলে যেতেন। নেতাদের মুখ থেকে ভাষণ শুনে চোখে কত আশার আলো জ্বালিয়ে ঘরে ফিরতেন। আশা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পূর্ণ হতো না। তবুও আদর্শচ্যুত হয়ে দলবদলের কথা ভাবেননি ওঁরা।

প্রতিবাদী কণ্ঠে নিভা বললেন— 'তুই যে কত অপরিণত তোর কথাতেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। ওরে, রাজনীতি কখনও পেশা হয় না। ওটা একটা আইডিওলজি! যার যে মতাদর্শে বিশ্বাস সে সেই দলের হয়ে কাজ করে, দেশের দশের সেবা করে। নিজের আখের গোছানোর নাম রাজনীতি নয়। রাজনীতি মানে দেশের মঙ্গলের জন্য। জনসাধারণের সুখ শান্তির জন্য নিঃস্বার্থ হয়ে কাজ করে যাওয়া। তোর আগে আর কেউ বোধহয় কোনওদিন এমন স্বার্থপর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রাজনীতিকে দেখেনি ভাই! শোন, এসব কথা ঘুণাক্ষরেও অন্য কারও কাছে বলিস না। লোকে তোকে খারাপ ভাবতে পারে। আগে লেখাপড়া শেষ কর, মন পরিণত হোক, তখন না হয় এসব নিয়ে ভাববি।'

সমীন্দ্রনাথ স্মিত মুখে বলেছিল— 'আমার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই ভাববে দিদিভাই, ভাববে। আজ মাত্র উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে একা যা ভাবছি, আগামী দিনে দেখবি হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ঠিক এই ভাবেই ভাবছে। দিদিভাই, আদর্শের জন্য রাজনীতি করার যুগ শেষ। তোরা চোখ বন্ধ করে থাকিস বলে দেখতে পাস না, এখন একটা নেতাও নেই দেশে, যার আদর্শ আছে। তোদের চেনা আইডিওলজি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে মুছে যাচ্ছে রাজনীতি থেকে। ভবিষ্যতে শুধু টাকার খেলা চলবে। দেশবাসীর কষ্টার্জিত উপার্জনের ওপর ট্যাক্সের ফান্দা লাগিয়ে এক্সচেকারে টাকার হিমালয় জমবে, আর সেই রাজার ভাণ্ডার ভোগ করবে মাত্র গুটিকয় মানুষ। বিনা শ্রমে রাজপ্রাসাদের মতো কয়েক একর জমির ওপর বাংলো, যাবতীয় রাজসুখ পেলে কোন্ বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েটা এল ডি ক্লার্ক কিংবা ইস্কুলের দিদিমণি হতে যাবে, বল তো? তোর এই বাচাল ভাইয়ের কাছ থেকে জেনে রাখ— অদূর ভবিষ্যতে রাজনীতি একটা লুক্রেটিভ বিজনেস হতে যাচ্ছে। পরে মিলিয়ে নিস।'

— 'এ বুধিয়া, এ ভাঁদো, এ সুরিয়া— সাত সক্কালে সার্থির চিৎকারে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে আদিবাসী গ্রামের ছেলে-বুড়ো সবাই। — 'কা হইল বা কাকি? চিল্লা রহৎ কাঁহে?' — উদ্‌ভ্রান্ত সার্থির (সারথী) দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে সবাই।

— 'আরে, মা কা তবিয়ৎ রাত কো খারাব হই গলা। দম্ ফুল রহৎ হ্যাঁয়। হম্ ক্যা করেঁ?'

মার শরীর খারাপ হয়েছে শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে নৈঃশব্দ্য নেমে আসে, পরক্ষণেই সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কেউ মা'র ঘরের মুখী দৌড়য়, কেউ গ্রামের ওঝাকে ডাকতে ছোটে তো কেউ এন জি সার (এন জি ও)কে ধরে আনতে দৌড়ায়। আগে এন জি ও বলে কিছু ছিল না যখন, তখন এই নিভা মা-ই গ্রামবাসীদের সহায়-সম্বল ছিল। সর্দি-কাশি, জ্বরজ্বালা, পেটের অসুখ এমনকি ম্যালিরিতেও (ম্যালেরিয়া) মা-ই ওদের ওঝা, মা-ই ডাগদারণী ছিল। গ্রামের পাঁচ-দশ মাইল দূরে লাগাতার অভ্রের খাদান। এই গ্রামেরই কত লোক বাঁচার তাগিদে ঘর ছেড়ে চলে গেছে খাদানে কাজ করতে। এখানকার বাতাসে অদৃশ্য ভাবে মিশে থাকে অভ্রের ধুলো। গাছের সবুজ পাতায়, গেরুয়া মাটিতে রোদ পড়লে চিক্‌চিক্ করে সেই রূপোলী ধুলো। চাঁদের মতো রূপোলী বলেই হয়ত গ্রামের নাম চাঁন্দডুংরী। যারা খাদানে কাজ করতে যায়, কয়েকবছর পরেই খুস্‌খুসে কাশির কারণে ছাঁটাই হয়ে ঘরে ফিরে আসে ফুসফুসের বারোটা বাজিয়ে। এদের পুরুষরা তীর ধনুকের অব্যর্থ লক্ষ্যে দক্ষ শিকারী, রমণীরা নিপুণ ঝুড়ি-টুকরি বানাতে। অফুরন্ত পড়ে থাকা জমিন ঝোপঝাড় কেটে কৃষিযোগ্য করে তোলার দক্ষতা তো দূরের কথা, জ্ঞানটুকুও ছিল না। শিক্ষা বলে কোনও কিছুই ছিল না। কোনও এক মাইকা মাইনস্-এর মালিক নিজের প্রয়াত বাবার নামে কয়েকটা গ্রামের প্রাথমিক স্কুল খুলেছিলেন। এই চাঁন্দডুংরী সেরকমই একটা গ্রাম। সমু সেই নিদারুণ দুঃসময়ে পাশে দাঁড়িয়েছিল যে সময়টা ভুলে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করেও সফল হলেন না আজও। স্কুল তো খোলা হলো, কিন্তু পড়াবে কে? এই দুর্গম জঙ্গলে মোটা মাইনের লোভেও শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছিল না। আর, নিভা আর নিখিলের প্রাণ বাঁচানোর জন্য তখন এরকমই একটা অগম্য গোপন আস্তানার প্রয়োজন ছিল। নিখিল আসতে পারেনি; সে নিভার নিখিলভুবন থেকে চিরতরে চলে গিয়েছিল। ওর আদর্শ বুকে বেঁধে নিভা এসেছিলেন— একা। চাঁন্দডুংরী গ্রামের জঙ্গলের অন্ধকার ভেদ করে সূর্য উঠেছিল। প্রাথমিক স্কুল, স্বাস্থ্য, রাঁচীতে মাটি নিয়ে গিয়ে সয়েল টেস্ট করিয়ে আনা, নিজে কৃষিকার্যের প্রাথমিক পাঠ পড়ে মানুষগুলোকে ধীরে ধীরে বুঝিয়ে-শুনিয়ে চাষের কাজে আগ্রহী করে তুলেছিলেন কয়েক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে। গ্রাম থেকে হাইওয়ে পর্যন্ত পায়ে চলা ফিতের মতো পথকে ওদের দিয়েই গোরুর গাড়ি চলার মতো চওড়া মাটির

রাস্তা বানিয়েছেন। সহজ-সরল, চিরদিন অবহেলিত মানুষগুলো নিভার নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করেছিল। জীবিকার পথ দেখানো নিভাকে মা বলে ডাকতে শুরু করেছিল। মাত্র বছর তিনেক আগে এন জি ও-রা এসে বিগত ৩৭ বছর ধরে একজন নারীর অনবদ্য প্রয়াস দেখে শ্রদ্ধায় 'মা'র সামনে মাথা নত করেছিল। নিভামাতাজীর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে শুনে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একমাত্র স্ট্রেচারটি নিয়ে ছুটে এলো রাকেশ সিং। সবচেয়ে নিকটবর্তী খাদানের ছোট হাসপাতালটাও পাঁচ মাইল দূরে। তাই সই! নিঃসন্তান নিভার একশত পুত্রকন্যা হয়েছে ৪০ বছরে। পাল্টাপাল্টি করে কাঁধ পাল্টে তাঁকে নিয়ে পৌঁছাল ওরা ডাক্তারের কাছে।

জেনারেল ফিজিশিয়ান মন দিয়ে পরীক্ষা করলেন আগে অক্সিজেন লাগিয়ে দিয়ে। নিভা সজ্ঞানেই ছিলেন, সবই দেখছেন— শুনছেন। বুকে যেন ভারী কিছু চাপানো হয়েছে, তাই চাপচাপ ব্যথা আর স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসে বাধা। ডাক্তার বলেছিলেন— মনে হচ্ছে আটারী ব্লক। এখানে তো কার্ডিওলজিস্ট নেই! কয়েকটা টেস্ট ইমিডিয়েটলি করানো দরকার ওঁর। সেজন্য শহরে যেতে হবে। তবে এক্ষুনি শিফট্ করা উচিত হবে না। প্রেসার হাই রয়েছে। একটু স্টেবল্ হলে নিয়ে যাবেন।

খাদান থেকে গাড়ি যোগাড় করে এন জি ও-র ছেলেরা তাঁকে কোডারমায় নিয়ে গিয়েছিল। দু'দিন পর। ই সি জি রিপোর্ট ভাল আসেনি। ইকো কার্ডিওগ্রামও তথৈবচ। টি এম টি নিভা করতেই পারেননি। কার্ডিওলজিস্ট বললেন— হার্টের আটারীতে কয়েক জায়গায় ব্লক রয়েছে বোঝা যাচ্ছে। এনজিওগ্রাম করাতে হবে। রাঁচী বা পাটনায় করিয়ে নিতে পারেন। এনজিওগ্রাম হলেই বোঝা যাবে, স্টেন্ট্ বসালে কাজ হবে নাকি বাইপাস সার্জারীর প্রয়োজন। দেরি করবেন না। এই ওষুধগুলো নিয়ম মেনে খেতে হবে। রেস্টে থাকবেন ম্যাডাম। টেনশন একেবারেই করবেন না।

রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হলে কি হবে, সমীন্দ্রনাথ ঠিক ৬টায় ঘুম থেকে উঠলেন নিয়মমত। প্রাতঃকৃত্য সেরে ট্রেড মিলে দৌড়লেন যথারীতি। স্নান সেরে একেবারে তৈরি হয়ে ব্রেকফাস্ট টেবিলে এলেন। প্রাত্যহিক নিয়মে সই-সাবুদ, ফোন, খেতেখেতেই চলতে লাগল। এরপর রয়েছে সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের সঙ্গে বাইরের ঘরে দেখা করা, সাংবাদিকদের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে মাছি তাড়ানো, তারপর পার্টি অফিসে যাওয়া, সেখান থেকে নিজের কন্সটিটিউয়েন্সীতে জনতার সঙ্গে মোলাকাৎ করে তাদের হাল-হকিকৎ জানা। সেটা মিটিং ডেকে কখনও করেন না তিনি। ভোটরে সময় যেমন এক একটা অঞ্চলে ভোট চাইতে পাড়ায় পাড়ায় হাতজোড় করে যান প্রার্থী হয়ে, ঠিক তেমনই করেই ঘরে ঘরে দেখা করার মতো যান তিনি। আর তাই জনতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অটুট হয়ে জুড়ে থাকে। —'ভোটের সময় আসে তারপর আর টিকির নাগাল পাওয়া যায় না'— এমন অপবাদ সমীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে কেউ দিতে পারে না। তিনি জানেন, যে রেপুটেশন তৈরি করে ফেলেছেন, সেটা সহজে ভাঙবার নয়। কোনও পার্টির ব্যানার নিয়ে না দাঁড়িয়ে একেবারে নির্দল প্রার্থী হয়ে ইলেকশনে দাঁড়ালেও তাকে হারায় এমন সাধ্য কারও নেই। তাই তো জনসংযোগের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র গাফিলতি সহ্য করতে চান না সমীন্দ্র।

একফাঁকে চিত্রা জিজ্ঞেস করলেন— 'ওপরে যাচ্ছো তো একবার? বলেছিলাম না, আজ একবার বাবার সঙ্গে দেখা করতে?'

নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে অপরাধী মুখ বানিয়ে সমীন্দ্র বলেন— 'বলেছিলে তো! কিন্তু কি করব বল? এত টাইট শিডিউল! কোনটা করি আর কোনটা ফেলে রাখি সেটাই বুঝতে পারি না।... আচ্ছা, আজ রাতে ফিরে এসে দেখা যাবে। এখন বেরোনোর সময় তুমি আর মুখখানা মেঘবর্ণ করো না প্লিজ!'

পার্টি অফিসে যেন আগুন লেগেছে। লালগড়, জঙ্গলমহল, যৌথবাহিনী, মাওবাদ নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে। একদিকে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের বহতী হাওয়া অন্যদিকে ইউ পি এ কোয়ালিশনে ফাটলের আশঙ্কায় নিজের দলকেই দোষারোপ পাল্টা দোষারোপের বাক-বিতণ্ডা পরিবেশকে অগ্নিগর্ভ করে তুলেছে। সমীন্দ্র এসবের মধ্যে অপ্রয়োজনে নাক গলাতে চান না। তিনি জানেন আজ যে যা বলছে কাল সেগুলো তার বক্তব্য ছিল না বলবে। 'মিসকোট' শব্দটার যথেচ্ছ প্রয়োগ না জানলে নেতা হওয়া যায় না। ক্লাশ নাইনে পড়ার সময় পিসেমশাই আর বাবার আদর্শের দল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়ে পোস্টার সাঁটতেন, দেওয়ালে লিখতেন। সেসময় এত দল কোথায় ছিল? কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ, আর দু-তিন টুকরোয় ভাঙ্গা কমিউনিস্টরা। বেশ কয়েকবার দল বদল করেছেন, মুখ্য তিনটে দলের ভেতরে ঘোরাফেরা করে একটা মোদ্দা কথাই জেনেছেন— দেশ, দেশের জনতার কথা একেবারে আঙ্গুলে গোণা ২-৪ জন ছাড়া কেউই 'রিলিজিয়াসলী' ভাবে না। দেশের সবচেয়ে পুরনো দল তো স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম দিনেই রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে বংশ পরম্পরায় সিংহাসন দখল, দেশী-বিদেশী চোর-জোচ্চোর

স্বজন পোষণ করে সর্বনাশের সীমা পার করে ফেলেছে। বাকি দুটো পুরনো দল অবশ্য এত নোংরামী এখনও করে উঠতে পারেনি, তবে ভেতরে ভেতরে ক্ষমতা দখলের খেয়োখেয়ি, কামড়া-কামড়ি করে করে প্রকৃত দেশভক্ত দলটাই জনমানসের সামনে ইজ্জত হারিয়ে ফেলছে। আর অন্য আর একটাকে তো দেশের মানুষ চাইনিজ এগ্রেসনের পর থেকেই সন্দেহের নজরে দেখছিল, এখন অস্তিত্ব সংকটে প্রায় অবলুপ্ত হতে চলেছে। সেই সব ছিদ্র দিয়ে রিজিওন্যাল হাড়ে হারামজাদা পার্টিগুলো রক্তবীজের ঝাড়ের মতো জাতপাতের রাজনীতি নিয়ে এসেছে। পুরনো তিনটে দলে শিক্ষার আভিজাত্য ছিল, কিছু আদর্শ অবশিষ্ট ছিল, কিন্তু এইসব নতুন গজিয়ে ওঠা দলগুলোর মধ্যে আদর্শ বলে কিছু নেই, শিক্ষা-দীক্ষার কথা তো দূর অস্ত। ওরা লুটেপুটে রাজা-মহারাজার মতো থাকতে আসে, শুধু শরীর থেকে গু-গোবরের হাজার বছরের গন্ধটাকে তাড়াতে পারে না। সমীন্দ্রনাথ জানেন তিনি নিজেও আদর্শবাদী নন। শরীরে গু-গোবরের বদলে অগুরু-চন্দনের গন্ধ থাকলেও উদ্দেশ্যে ওদের থেকে আলাদা নন। তফাৎ এটুকুই যে ওরা জন্ম-জন্মান্তরের বুভুক্ষু ক্ষিদে নিয়ে এসেই খেতে শুরু করে বলে দু'দিনেই নেকেড হয়ে ধরা পড়ে যায়। আর উনি বা ওনার মতো অন্যরা রয়েসয়ে ধীরেসুস্থে চিবিয়ে খান বলে সহজে হজম হয়। ধরা পড়েন না।

— 'এই যে! সমীন্দ্র এসে পড়েছে।'— অরুণ অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের অরুণ নিয়োগী বলে ওঠেন— 'এসো হে হবু মন্ত্রী এসো।' — অরুণের বলার ধরনে কটাক্ষ ছিল।

সমীন্দ্র বসতে বসতে বলেন— 'তাই নাকি? আপনার মুখে ঘি-শক্কর। ... এত বিতর্ক কি নিয়ে হচ্ছে বলুন তো?'

সুমঙ্গলদা বলেন— 'পরিবর্তনের তুফান যে সকলের পালের হাওয়া কেড়ে নিচ্ছে বুঝতে পারছ না? এখনও সামাল না দিলে আগামী জেনারেল ইলেকশনে ভরাডুবি আটকায় কে? চৌত্রিশ বছরের লালদুর্গে ধস নামিয়ে ফেলে দিল। এবার আমাদেরও আত্মবিশ্লেষণের সময় এসেছে। ভুলত্রুটি যা হয়েছে সেসব নিয়েই বিতর্ক। ... শোনা যাচ্ছে, কেন্দ্রে মন্ত্রিসভায়ও পরিবর্তনের আভাস দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তোমার নামটা ঘুরেফিরে আসছে নাকি?'

— 'পরিবর্তনের আভাস দিয়েছেন বটে, তবে আমার সঙ্গে কেউ এখনও কথা বলেননি সুমঙ্গলদা। তাই আমার নামটা ঘুরেফিরে আসার খবরটা নিয়ে আমি নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারি না।'

অরুণ নিয়োগী ফোড়ন ছাড়েন— 'আরে, তুমহারা সিতারা বুলন্দ। এত বার দলবদল করে আগেও মন্ত্রী হয়েছ এবারেও হবে... ঐ বিদ্যাচরণ শুক্লার মতো। আমরা রাজ্যেই থেকে যাবো, তুমি থাকবে দিল্লীতে।'

সমীন্দ্র মুখখানা কঠিন পাথরের মতো করে উত্তর দেন— 'একটু আগেই আপনারা আত্মবিশ্লেষণ করে নিজেদের দোষ-ত্রুটি খুঁজছিলেন না? এই হলো আমাদের প্রথম দোষ। পরশ্রীকাতরতা! কেউ এক পা এগোচ্ছে শুনলেই আমরা সহ্য করতে পারি না। কি করে তার ঠ্যাং ধরে টেনে ল্যাং মেরে নিজেকে এগিয়ে দেব এসব ভাবতে গিয়ে কাজের কাজ ভুলে যাই, ঠেকায় পড়ে আত্মবিশ্লেষণ করতে বসি, কিন্তু সেটাই করা হয়ে ওঠে না। ... অনেকবার দল বদল করেছি কিনা বিদ্যাচরণ শুক্লার মতো, তাই সব দলেই একই দৃশ্য দেখে দেখে আমার মনে হয় এখন উড়ো কথায় কান না দিয়ে বরং দেশ এবং পার্টির স্বার্থে আসুন সত্যিকারের আত্মবিশ্লেষণ করে দেখি আমরা নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে কে কতটা ভুল করে চলেছি। নিজের কৃত দোষত্রুটি মেনে নিয়ে। শুধরে নিলেই ইমেজ ভাল হবে— নিজেরও, পার্টিরও। তখন হয়ত আমার বদলে অরুণকেই ম্যাডাম বেশি যোগ্য মনে করবেন, অরুণই মন্ত্রী হবে। রাজনীতিতে সব রকম ঘটনাই ঘটতে পারে। বড্ড আনপ্রেডিক্টেবল বিষয় তো?' — অরুণ নিয়োগীর বিরুদ্ধে ইরিগেশনের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ উঠেছে জানেন সমীন্দ্র। তাই মোক্ষম জায়গায় খোঁচা মেরেই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন অবলীলায়।

নিজের কন্সটিটিউয়েন্সী থেকে ফেরার পথে সারাদিনের ক্লান্তিতে চোখ যেন বুজে আসছিল, কিন্তু কানের মধ্যে মাছি ঢোকার মতো অরুণের কথাটা ভন্‌ভন্‌ করছিল— ওই বিদ্যাচরণ শুক্লার মতো। কলেজ জীবনেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ ছেড়ে কংগ্রেসে এসেছিলেন। সেটাও পরিবর্তনের ভয়ঙ্কর সময়। একদা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পদ, শ্রেষ্ঠ সব তরুণ তুর্কীরা নক্সালবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দলত্যাগ করে নক্সালদের খাতায় নাম লেখায়। তখনকার ছাত্র জগতের উজ্জ্বল সব জ্যোতিষ্করা হাজার বছর ধরে চলতে থাকা সামাজিক, অর্থনৈতিক পীড়ন আর শোষণের বিরুদ্ধে জেগে ওঠা এক মহাবিপ্লবে যোগ দিয়েছিল আইডিওলজির তাগিদে। দিদিভাই একদিন বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল— 'ছিঃ সমু! রাজনীতি কখনও পেশা হয় না, রাজনীতি হলো জীবনের একটা আদর্শ, আইডিওলজি।' দিদিভাই বড্ড বেশি মাত্রায় আদর্শে বিশ্বাসী ছিল, তাই প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম জ্যোতিষ্ক নিখিল মিশ্রর প্রেমে পড়ল। চাল নেই চুলো নেই, নিধিরাম সর্দার নিখিল মিশ্রর দুটো জিনিস ছিল। এক নম্বর হলো, মেধা আর দু'নম্বর হলো আদর্শে নিষ্ঠা। আমি আমার দিদির শুধু প্রিয় ভাই ছিলাম তা তো নয়! আমরা দু'জন একে অন্যের বন্ধুও তো ছিলাম। কতরকম ভাবে দিদিভাইকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি—'এই সম্পর্কটিকে আর এগোতে দিস না লক্ষীটি। সময় ভাল নয় রে! কখন কি ঘটে বলা যায় না।'— শুনতো না আমার কথা। উল্টে বলত— 'ভাই, যাদের জীবনে আদর্শ নেই, তাদের চরিত্রও নেই। নিখিল আমাদের চেয়েও গরীব, ওর চালচুলো নেই, আমি জানি। কিন্তু ওর একটা মজবুত চরিত্র আছে রে। আমি টাকাপয়সা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জোয়ারে ভাসতে চাই না। আমি আদর্শবান, চরিত্রবান নিখিলকে শুধু চাই।'

আমার কোনও আদর্শ-টাদর্শ নেই। ছিলই না কোনওদিন। আমি বাবা-পিসেমশাইদের কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়েছিলাম, কারণ ওঁরা যেমন সারা জীবন একটা পার্টিতে বিশ্বাস করে নিজেদের জন্য কাঁচকলাটাও পায়নি, তেমনি আমিও আমার সময় ব্যয় করে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে তো দূরের কথা জোনাল লেভেলেও সামান্য একটা পদও পাইনি। সারা জীবন ধরে বাবাদের মতো পায়ে ফোস্কা ফেলে ব্রিগেডের জনসমাবেশে ভীড় বাড়াতে যাবার ইচ্ছে আমার আর ছিল না। আমার একটা আইডেনটিটি চাই। সহস্র সহস্র মানুষের ভীড়ে আর একজন শ্রমজীবী হয়ে আমি কিছুতেই থাকব না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শরীরের রক্ত জল করে শ্রম দিয়েছি। শ্রমদরদীরা আমাকে মূল্য না দিয়ে কৃতদাস বানিয়ে রাখতে চেয়েছে, তাই ছেড়েই ওদের সঙ্গ। রাজ্যে কেন্দ্রে তখন কংগ্রেসের সরকার। ওরা আমার কর্মদক্ষতার মূল্যায়ন করেছিল। কত কম বয়সে এ্যাসেম্বলী ইলেকশনে টিকিট দিয়েছিল। জিতেও গেলাম। দিদিভাইর খবর রাখি না কে বললো? গোপনে খবর রাখি বৈকি! আগে দু-তিনবার চিঠি দিয়েছি। ও উত্তরও দিয়েছে। তারপর আর যোগাযোগ রাখিনি, তবে আমার মনিটরে ওকে ধরে রেখেছি। জঙ্গলে জায়গায় পড়ে আছে বলেও বাবার আমার ওপর রাগের একটা কারণ জানি আমি। আমি তো হাতে পায়ে ধরে সাধাসিধে করেছিলাম— যাস না দিদিভাই। আমার কাছে থাক তুই। আমরা থাকতে তুই কলকাতা ছেড়ে আদিবাসীদের কাছে চলে যাবি, এ কি হয়? — শোনেনি আমার কথা। ভালো আছে ও সে খবর আমি জানি। তন্দ্রাচ্ছন্ন সমীন্দ্রনাথের বুকের ভেতর যেন ছলাৎ করে একটা শব্দ হয়ে থেমে যায়, আর সাথে সাথেই গাড়িটাও জবরদস্ত ব্রেক মারে।

— 'কি .. কি হলো রমেন?'

— 'কিছু না সায়েব। একটা বেড়াল পার হচ্ছিল।'

— 'এ্যাই -এ্যাই-এ্যাই একদম এগোবে না।' — সটান খাড়া হয়ে বসেন সমীন্দ্রনাথ— 'খুব অশুভ। সাইড করে লাগাও গাড়ী। একটা কিছু পার হোক, তারপর যাবে।'

— 'আমাদের অন্য গাড়িটাই আসছে পেছনে।'

— 'সুনীল এসব জানে, ও অন্য কোনও যান যাওয়ার অপেক্ষা করবে।'— এই ড্রাইভার-ট্রাইভাররা সারাক্ষণ, সর্বগন্তব্য স্থলের সঙ্গী। আমাদের কত দুর্বলতার কথা যে ওরা জানে, তার ইয়ত্তা নেই। আগে আমি এসব কুসংস্কার ঘৃণা করতাম। কবে থেকে এ রোগ ধরল আমাকে? সমীন্দ্র জীবনের পেছন দিকে ফিরে তাকান। তার সব মনে আছে। এসব কুসংস্কার কবে থেকে এলো, কেন এখনও প্যারানইয়াতে ভুগে লজ্জিত হন এইসব সাধারণ লোকের কাছে! নাহ! এখন থেকে প্রকাশ্যে এসব দুর্বলতা দেখানো বন্ধ করতে হবে, তা নাহলে যা দিনকাল পড়েছে, কোন্‌দিন শালার মিডিয়ার কানে পৌঁছে যাবে, সমীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রাস্তায় বেড়াল পথ কাটলে গাড়ি থামিয়ে রাখেন। রাজনীতি কি দুর্নীতি না করে করা যায়? কখনও না। মহাভারত সাক্ষী, ইতিহাস সাক্ষী দূরদর্শী রাজনীতিবিদরা সকলেই কিছু অন্যায় করেই নিজের উদ্দেশ্যে সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাবড় তাবড় দেশপ্রেমী নেতারা একটা স্বার্থ রক্ষা করতে অন্য স্বার্থটিকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন বৈকি? কেন, আমাদের মহাত্মা গান্ধী পাপ করেননি তাঁর দুই মানসপুত্র জওহর আর জিন্নার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হবার আবদার মেটাতে গিয়ে দেশটাকেই দু'টুকরো করে দিয়ে? স্বার্থপরতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তো জাতির জনকই স্থাপন করে গেছেন। আমি কোন্ ছার! দেশের কোটি কোটি মানুষের কথা না ভেবে শুধু জওহর আর জিন্নার স্বার্থ দেখেছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছেন। তবুও যদি এদেশ তাঁকে মহাত্মা বলতে পারে, বাপু বলতে পারে, দেশের জনক বলে পূজা করতে পারে, তাহলে আমি তো একটিপ্ নস্যি মাত্র। স্বাধীন ভারতের পথপ্রদর্শক বলে যাদের হাতে তিনি ক্ষমতা তুলে দিয়ে গেলেন তারা কতটা পথ দেখিয়েছেন আর কতটা ক্ষমতা ভোগ করছেন সেসব কথা পুরো দেশটাই জানে। আজ আর কেউ একথা বলতে ভয় পায় না যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে কাশ্মীরের জেলে গোপনে হত্যা করা হয়েছিল। নেতাজী সুভাষকে দেশে আসতে দেওয়া হয়নি। এমনকি ভালমানুষ লালবাহাদুর শাস্ত্রীকেও রাশিয়ার হোটেলে ... থাক। পথপ্রদর্শকদের দেখানো কায়েমী স্বার্থপরতার পথ কলঙ্কময়, তবুও ওরা যদি চুনকালি মাখা বিদেশী ছাপমারা গোড়া গোড়া মুখগুলো নিয়ে রাজদণ্ড হাতে পেয়ে ৬৫ বছর ধরে লুটেপুটে খেতে পারে, যদি দেশের সম্পদ বিদেশে চালান করতে পারে, সকলের নজরের সামনে, তাহলে আমি সমীন্দ্রনাথ চক্কোত্তি ভূমিপুত্র হয়েও কেন ছলেবলে কৌশলে হলেও ক্ষমতার স্বপ্ন দেখব না? ক্ষমতা এখন আর কেউ কারও পাতে পরিবেশন করে না 'বাপু'র মতন। এখন যেমন করে পারো দখল কর নিজের ক্যারিশ্‌মার জোরে, নাহলে সর্বহারার ভীড়ে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে থাকো। ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য ধুয়ে জল খেয়ে সাধুসন্ত হবার কোনও ইচ্ছে আমার ছিল না, এখনও নেই। সুযোগ এলে আমি সেটাকে কাজে লাগাবোই লাগাবো, বাই হুক্ অর বাই ক্রুক। দুর্বলতাকে আর প্রশ্রয় দিও না সমু— নিজেই নিজেকে বোঝান দাপুটে কংগ্রেসী এম পি।

পাখিরা ঘুম থেকে জেগে উঠছে। সারারাত নির্ঘুম নিভা বিছানায় শুয়ে ওদের ডানা ঝাড়া, খুব আস্তে কিচিরমিচির করার শব্দ শুনছেন। ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলেন। রাতে খাওয়ার আগে তাঁর অন্যতম মেয়ে কাঁকড়ী যত্ন করে খাইয়ে দিয়েছে— সব ওষুধগুলোই। কিন্তু মাঝে একটু তন্দ্রা মতো হওয়া ছাড়া ঘুম হলো না। মনের মধ্যে কার্ডিওলজিস্টের কথাগুলো ঘুরেফিরে আসছিল সারারাত— 'দেরী করা একেবারেই চলবে না ম্যাডাম।' — কি করব আমি? সেদিনের সমস্ত খরচ এন জি ও থেকে দিয়েছে। কিন্তু বাইপাস প্রয়োজন হলে অতটা ওরা করতে পারবে না। আর আমিও নিতে পারব না। ওদের টাকা আসে আদিবাসী কল্যাণের জন্য। সে টাকায় আমার চিকিৎসা করানোর হক নেই। গ্রামের মানুষ অন্য উপায় না হলে সেটাই করতে চাইবে। কিন্তু এটা আমার নীতিবিরুদ্ধ। নিখিলেরও নীতি বিরুদ্ধ ছিল এসব সুযোগ গ্রহণ করা। উফ্ঃ! নীতির জন্য, আদর্শের জন্য চরম মূল্য দিয়েছে নিখিল। পুলিশ কাস্টডিতে ওরা পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল নিখিলকে। আমি ওকে শেষ দেখাও দেখতে পাইনি। মহিলা পুলিশরা তখন আমার ওপর থার্ড ডিগ্রী চালাচ্ছিল। ওরা আমাকে জানতে দেয়নি যে নিখিলকে মেরে ফেলা হয়েছে। ওরা শুধু নিখিলকে নয়, আমাকে থার্ড ডিগ্রী দিয়ে আমার গর্ভে থাকা নিখিলের সন্তানকেও হত্যা করেছে। আমার সব প্রিয়জন, মা, বাবা, মাইমা, নিখিল, আমাদের সন্তান— সবাইর মৃত্যুর পরও আমি কি করে বেঁচে আছি এত বছর ধরে? কিসের আশায় বেঁচে আছি? আমার প্রতিশোধ স্পৃহাও নেই, ছিলই না কখনও। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, রঞ্জিত গুপ্ত, রুনু গুহনিয়োগীরা, যারা নিখিলকে, আমার সন্তানকে, নিখিলের মতো আরও হাজার হাজার সম্ভাবনাময় সুসন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা করে গঙ্গার জল লাল করেছিল, তাদের মতো পশুর বিরুদ্ধে মানুষ কি প্রতিশোধ নিতে পারে? তাদের থেকেও অনেক বড়ো মাপের জানোয়ারের দরকার হতো। বিগত চল্লিশ বছরে ওরকম জানোয়ার আর একটাও পয়দা হয়নি, যে এদের শাস্তি দিতে পারে। শিক্ষা, সংস্কৃতির পীঠস্থান বলে পরিচিত কোলকাতার

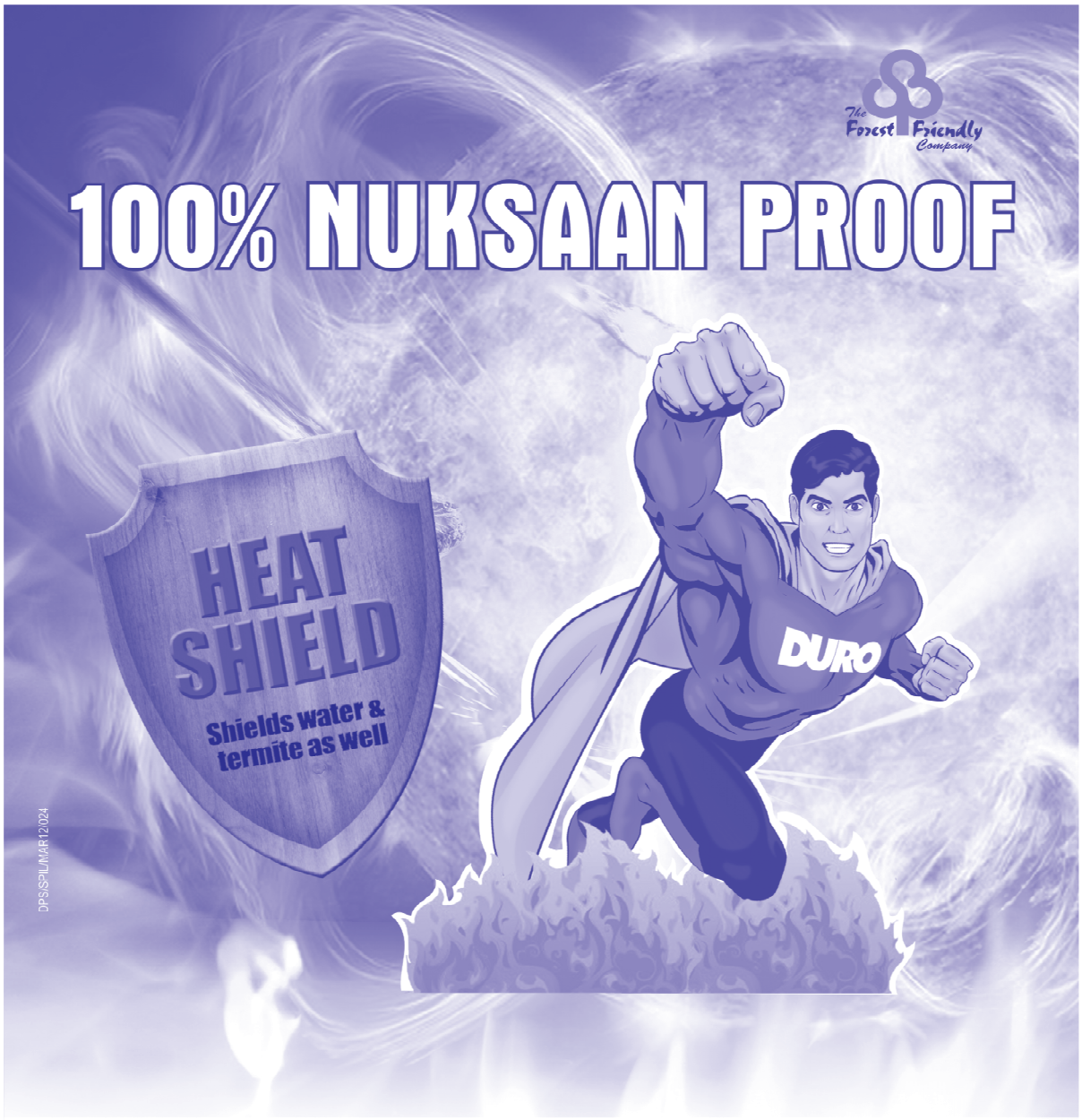

The Forest Friendly Company
100% NUKSAAN PROOF
HEAT SHIELD
Shields water & termite as well
DURO
DPS/SPIL/MAR12/024
Select DURO products come with a unique Heat shield – a classified heat resistant formula. The result of a dedicated R&D team & their well researched venture, DURO's Heat Shield technology ensures complete fire proof protection. Invest in them. Prevent your dreams from turning to ashes when there is still time.
FSC
www.fsc.org
FSC® C108194
The mark of responsible forestry
DURO
BLOCK BOARD • PLYWOOD • VENEERS • DOORS
Sarda Plywood Industries Ltd. Website: www.sardaplywood.in | E-mail: info@sardaplywood.com | Toll Free Number: 1800-345-DURO(10am - 6pm Monday-Friday)
OUR BRANDS
Pumaply
ALL WEATHER PROOF PLYWOOD
DUROFLEX
PREMIUM FLEXIBLE PLYWOOD
DURODOOR
FLUSH DOOR
NATURE'SIGNATURE
PREMIUM VENEERS & PLYWOODS

বর্বরতার সাক্ষী আমি। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে সর্বস্ব খুইয়ে চিরকাল জংলী, অসভ্য বলে প্রচারিত এই আদিবাসী গ্রামে এসে বুঝেছিলাম, আসলে সভ্য কাদের বলে? এত বড়ো একটা লম্বা জীবন এদের সভ্য, সুন্দর সাহচর্যে কেটে যাচ্ছে। তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত সভ্য সমাজের পাশবিকতা প্রত্যক্ষ করার পর প্রতিজ্ঞা নিয়ে এখানে চলে এসেছিলাম— আর কোনওদিন কোলকাতা যাব না বলে। সেই প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে কোলকাতায় যেতেই হলো ভাইয়ের প্রতি আমার দায়বদ্ধতার কথা ভেবে। সমু যে আমার ছোট, আমার একটা মাত্র ভাই, আমার প্রাণের একটা টুকরো! আমার বাবা-মা'র দায় যে ওই বহন করেছে! সেই সব সময়ে ও নিশ্চয়ই পাশে দিদিভাইকেই পেতে চেয়েছে! না গিয়ে থাকতে পারি? মামা আর সমু ছাড়া আমার নিজের বলে আর তো কেউ নেই!

সমুটার দূরদর্শিতার সত্যিই জবাব নেই। সেই ষাটের দশকে রাজনীতিকে পেশা করার কথা বলত। তখন বিশ্বাস করতে পারিনি। একটা শতাব্দী পার হয়ে এসে এখন ওর কথার সত্যতা প্রমাণ হচ্ছে। এই দুর্গম গ্রামে বিদ্যুৎ নেই, কারও ঘরে ট্রানজিস্টার রেডিও নেই, রাকেশ সিং ছাড়া। বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন এই চাঁন্দডুংরী গ্রাম। ৩-৪ দিনের পুরনো খবরের কাগজ রাকেশ সিংদের এন জি ও-তে আসে। রাকেশ আবার সেগুলো আমাকে পাঠায়, তাই মোটামুটি খবর জানা হয় আমার। সমুর ভবিষ্যৎবাণী সত্য হয়েছে। এ যুগের তরুণ সমাজ রাজনীতিকে পেশা করতে বেশ আগ্রহী। আদর্শ মুছে গেছে তরুণ প্রজন্মের জীবন থেকে। এখন আদর্শের জন্য কাউকে আর মরতে হবে না। নিখিলরা সাম্যবাদের জন্য যে রিভলিউশন করতে গিয়ে প্রাণ দিল, বংশপরম্পরায় কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা যদি সেটাকে এমন নির্মম ভাবে গুঁড়িয়ে না দিত, তাহলে হয়ত দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোটা এতদিনে অন্য চেহারা নিত। নিজের জন্য, স্বজনের জন্য নয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সিস্টেমের বিরুদ্ধে ওদের সংগ্রাম। ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে শ্রেণী শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে পীড়িতকে পীড়নমুক্ত করে সমাজে সমান স্থান দেবার সংকল্প ছিল। বিদেশী টাকার সাহায্য তখন ছিল না। শুধু আত্মবিশ্বাস আর অসীম সাহস এবং কৃষকের লাঠি, শাবল, বল্লম, তীর-ধনুক, আর কান্ট্রিমেড রিভলবার, পাইপগান নিয়ে যুদ্ধে নেমেছিল ওরা।

বিছানা ছেড়ে নিভা উঠে বাইরের দাওয়ায় গিয়ে বসলেন। সাথী উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল। বললো— 'এত সকালে উঠে পড়লে যে?'

— 'ঘুম হয়নি রাতে।'

— 'সেকি? কাঁকড়ী রাতে ওষুধ খাওয়ালো যে? ডাক্তারসাব তো তোমাকে অনেক ঘুমোতে বলেছে মা?'

— 'বললে আর ওষুধ খেলেই কি আর ঘুম হয়? ভাবনা-চিন্তা থাকলে ঘুম আসে না।'

— 'এত কিসের চিন্তা তোমার? সারা চাঁন্দডুংরী গ্রাম আছে তোমার পাশে! সবাই বলেছে মা'র জন্য জান্ লড়িয়ে দেব, তবু তুমি চিন্তা করবে?'

— 'যা তো, এক কাপ চা করে এনে দে।'— নিভা জানেন, ওরা তাঁর জন্য জান্ দিতে পারে, কিন্তু দুশো টাকা জোগাড় করতে হলে দু'দিন ওদের উনুন জ্বলবে না। আড়াই-তিনলাখ টাকার বাইপাস সার্জারী মাথায় ঢুকবে না। একদিন যারা পিঁপড়ের ডিম খেয়ে আরও কত রকম অখাদ্য খেয়ে সারা শরীরে চর্মরোগ নিয়ে জীবনধারণ করেছে, ওরা ক'জন এখনও হার্টের অসুখের মতো রাজকীয় অসুখের নাম শুনেছে? ভালবাসার আবেগে জান্টা দিতে তৈরি হয়ে যাবে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই। কিন্তু জান্ নয়, দরকার টাকার। সেটা কোথাও নেই।

১৯৭০ সালের সেই ভয়ঙ্কর সময়ে সমু এই চাকরিটা যোগাড় করে দিয়েছিল। ও তখন দল পাল্টে কংগ্রেসে গিয়ে ঢুকেছে এবং নিজের একটা পরিচিতিও বানিয়ে ফেলেছে অল্প দিনেই। মাইকা মাইনস্'য়ের মালিক তিনখানা গ্রামে আদিবাসী ছেলেমেয়েদের জন্য হিন্দু শিক্ষামন্দির খুলেছেন। খড়ের চালের স্কুলবাড়ি, শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী। স্কুল তো বানালেন কিন্তু ওই অঞ্চলে শিক্ষক পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল কট্টর হিন্দুত্ববাদী মাড়োয়ারী খাদান মালিকের। খৃস্টান মিশনারীদের ঠেকাতেই তার এই শুভ প্রচেষ্টা। শিক্ষিত আদিবাসীরা সকলেই ধর্মান্তরিত খৃস্টান এটা তাকে বেদনাহত করত। ভাল মাইনের টোপ দিয়েও একটা স্কুলের জন্যও শিক্ষক পাচ্ছিলেন না। নিখিলের তো আর আসাই হলো না, নিভা এসেছিলেন নির্মম যন্ত্রণা বুকে নিয়ে। যা মাইনে পেতেন তার অর্ধেক অংশও নিজের জন্য খরচ করতেন না। খরচ করতেন এখানকার মানুষের জন্য। অনুর্বর জমিতে সার ঢেলে ঢেলে ক্ষেতের উপযোগী করে তোলার জন্য। এদের কৃষিকাজে আগ্রহী করে স্বনির্ভর করার জন্য। আর তার সঙ্গে টেনে হিঁচড়ে ছেলেমেয়েদের স্কুলে এনে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়ার কাজ তো প্রাথমিক কর্ম ছিল। এখানে এত কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে পেরেছিলেন বলেই নিখিলের অভাববোধ তাঁকে পাগল করে তোলেনি। কিন্তু, তখন তো ভাবেননি, জীবনে সঞ্চয়ের প্রয়োজন আছে, প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য!

বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু মঞ্জুরীর দাদা শুভ্রর বন্ধু ছিল নিখিল। দুই বন্ধুই নক্সালবাদী, প্রথম সারির প্রমুখ নেতা। নিখিল ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে এম এ করে পরিস্থিতির চাপে কোলকাতা ছেড়ে মেদিনীপুরের এক গ্রামের হাইস্কুলে চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিল। চারু মজুমদারকে পুলিশ এ্যারেস্ট

अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो
जान लेवा हो सकता है ।

SHREE
ULTRA
RED-OXIDE

जंग रोधक सीमेंट

SHREE CEMENT LIMITED

Registered Office :
Bangur Nagar, Beawar, Dist. Ajmer
(Rajasthan) 305 901
Phs. : +91 01462 228101-106
Fax : 01462 228117/119
e-mail : scibwr@shreecementltd.com

Corporate Office :
21 Strand Road, Kolkata 700 001
Phs. : +91 33 2230 9601-04
Fax : +91 33 2243 4226
e-mail : scical@shreecementltd.com

Marketing Office :
1 Bahadur Shah Zafar Marg
122/123, Hans Bhawan, New Delhi 110 002
Ph. : 09313565826
Fax : +91 11 22370499
e-mail : scidel@shreecementltd.com

website: www.shreecementltd.com

শারদীয়ার অভিনন্দন সহ ঃ—

Usha
Kamal

Kasat Marbles

19, R. N. Mukherjee Road
2nd. Floor, Kolkata - 700 001

Ph. No. Office : 2248-9947

Deals in : Marble, Granites Tiles,
Ceramic Tiles, Stone etc.

Authorised Dealer of

KAJARIA CERAMICKS LTD.
'NAVEEN' brand tiles
REGENCY CERAMICES LTD.
BELLS CERAMICES LTD.
ORIENT TILES

Showroom :
32A, Tollygunge Circular Rd. kolkata - 53
Show Room - 24004154 / 24002858

Godown :
3, Tarpan Ghat Road. Kolkata - 53
(Mahabirtala, B. L. Saha Road)
Godown : 2403-4014

Wadhwana

"Park Center"
24, Park Street,
Kolkata - 700016

Phone :2229-8411/1031/4352

Fax : 91 33 2229-0492

e-mail : wadhwana@vsnl.com

করেছে শুনে প্রতিবাদে মিটিংয়ে যোগ দিতে এসেছিল কোলকাতায়। আমি তখন ওইসব নক্সালবাদ-টাদ বুঝতামই না। ওর সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার পরও কোনওদিন আমাকে ওদের দলে যোগ দিতে বলেনি। নিজের মতবাদ অন্যের ওপর চাপাবার বিরোধী ছিল ও। ও কোনওদিন আমাকে প্রেম নিবেদন করেনি, মুখ ফুটে বলেনি— আমি তোমাকে ভালবাসি নিভা। এই কথাগুলো উচ্চারণ করাই যেন বাচালতা। আমি আমার উপলব্ধির দ্বারাই বুঝে নেব ওর মন— ও এরকমই ভাবত। প্রয়াতা মায়ের প্রতি কি অসীম শ্রদ্ধা ছিল। শ্রদ্ধা ছিল নিজের আত্মবিশ্বাসের ওপরেও। চরম দারিদ্র্যের সময়ও অভুক্ত মা-বেটা কারও কাছে হাত পাতেনি। সিলেটের পঞ্চখণ্ডের বিখ্যাত ব্রাহ্মণ মিশ্র পরিবারের বধূ হীরু সাহা-ধীরু সাহা নামে পূর্ববঙ্গীয় ব্যবসায়ী দুই ভাইয়ের রাঁধুনী বামুনমাসী হয়ে আমৃত্যু কাজ করতে কোনও সংকোচ বোধ করেননি। ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল— একথা আমার কাছে প্রকাশ করার সময় মায়ের গর্বে নিখিলের চোখদুটো জ্বলজ্বল করত। হীরু সাহা-ধীরু সাহাদের কাছে ওর কৃতজ্ঞতার ঋণের বোঝা যে একটা জীবনে শোধ করতে পারবে না, অকপটে সে কথা স্বীকার করতে বাধত না নিখিলের— 'জানো নিভা এই দুই ভাই মিশ্রবাড়ীর বৌকে কখনও রাঁধুনির নজরে দেখেননি। নিজের মায়ের সম্মান দিতেন। অবস্থাবিপাকে মাকে দুই ভাইয়ের রান্না করতে হতো বলে মরমে মরে থাকতেন হীরুদা-ধীরুদা। কতবার মাকে বলেছেন— মাসীমা, নিখিলকে নিয়ে এবাড়িতে এসে থাকুন বস্তি ছেড়ে। — মা রাজি হতো না। কত ছলে বলে কৌশলে যে দুই ভাই আমাদের মা-ছেলেকে সাহায্য করত, সেসব শুনলে অবাক হবে তুমি। মা এমন ফ্যাসাদে পড়ত যে ওদের মাতৃপূজার নৈবেদ্য গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হতো। হীরুদা-ধীরুদা না থাকলে এই নিখিল মিশ্র আজ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্কুল মাস্টার হতে পারত না নিভা। মা মারা যাবার পর ওরা আমাকে জোর জবরদস্তি করেছে ওদের সঙ্গে থাকার জন্য। দ্বিতীয়বার মাতৃহীন হয়েছে বলে দশটা দিন আমার সঙ্গে হবিষ্যি করেছে। — ভাবতে পারো, পর এত আপন হতে পারে?'

নিখিল ওর জীবনের কথা বলত আর আমার চোখে জল ভরে আসত। বুঝতে পারতাম, উদ্বাস্তু হয়ে এসে বাবাদের থেকেও অনেক বেশি কষ্ট ওরা পেয়েছে। সম্পূর্ণ একা এই সৎ, চরিত্রবান মানুষটার পাশে সারাক্ষণের সঙ্গী হয়ে থাকার তাগিদ অনুভব করতাম, কিন্তু ওর দিকে থেকে আহ্বান আসতো না। শেষ পর্যন্ত আমাকেই মুখ ফুটে বলতে হয়েছিল একদিন— 'নিখিল, তোমার একক জীবনের একপাশে আমার একটু ঠাঁই হবে?'

ও বলেছিল— 'পুরো জায়গাটা জুড়েই তো তুমি আছো নিভা।'— সেটা ১৯৬৯ সাল। বাবা আর মামা খুশি মনে বিয়েতে রাজি হয়েছিলেন। শুধু সমু ওর নিজের মতো করে বলেছিল— 'শেষ পর্যন্ত নিখিলদাকেই বিয়ে করছিস? নিখিলদা একটা সাচ্চা হীরে রে দিদিভাই। রতনে রতন চেনে। .. আমার শুধু একটাই ভয়, ওর পথটা যদি নক্সালবাদ না হয়ে অন্যকিছু হতো তাহলে শান্তি পেতাম। একটা মাত্র জামাইবাবুর বিরোধী শিবিরে একমাত্র শালাবাবুর অবস্থান? ধ্যাৎ!'

বিয়ের পর কোলকাতা ছেড়ে নিখিলের কর্মস্থলে মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত গ্রামে এসে পাতকুয়োর জল টেনে, হ্যারিকেনের আলোয় থেকেও কখনও অসুবিধা হচ্ছে বলে মনে হয়নি আমার। অসুবিধে একটাই— পার্টির কাজে যখন নিখিল কয়েকদিনের জন্য গ্রামের কৃষকদের কাছে যেত, তখন একা একা দমবন্ধ হয়ে যেত। নক্সাল আন্দোলন তখন তুঙ্গে। ঘন ঘন ওর কোলকাতা যাওয়াও ভাল লাগত না। বিপদের সমস্ত ফাঁদগুলো কোলকাতায় পাতা আছে শুধু, মেদিনীপুরে নেই। আমার কাছে থাকলে আমি ওকে ঠিক বাঁচিয়ে ফেলতে পারব। কোলকাতায় কে বাঁচাবে? সেখানে তো শুধুই রক্ত ঝরছে, গঙ্গা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নক্সালীদের লাশ। বন্ধু আর বন্ধু নেই, কাজীন ভাই ভাই নেই, শুধু দলগত রেষারেষি সমস্ত সম্পর্ককে তুচ্ছ করে দিয়েছে। আর এই সমস্ত অপকীর্তির পালে হাওয়া দিয়েছে সরকারি প্রশাসন। সেইরকম ভয়ঙ্কর সময়ে একদিন সন্ধ্যে পার হওয়া অন্ধকারে দরজায় কড়া নাড়লে দরজা খুলেই ভয়ে আঁতকে উঠেছিলাম। কালো চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকা আগন্তুক জরুরি গলায় বলে উঠেছিল— 'ভয় পেও না নিভা, আমি শুভ্রদা। আমার পেছনে পুলিশ তাড়া করছে। ভেতরে আসতে দাও।'

ভেতরে এসেই শুভ্রদা জিজ্ঞেস করেছিল— 'নিখিল কোথায়?'

— 'ও কুয়োতলায় গা ধুচ্ছে।' — বলেছিলাম আমি।

— 'আমাকে কিছু খেতে দিও নিভা। গত দু'দিন ধরে কুকুরের মতো দৌড়চ্ছি। পেটে দানাও পড়েনি।'— আমি কলা আর নারকেল নাড়ু এনে দিয়ে বলেছিলাম— 'এখন এগুলো খেয়ে জল খান। এক্ষুনি খিচুড়ী বানিয়ে দেব শুভ্রদা। আপনিও স্নান করুন, তাতে শরীরের ক্লান্তি দূর হবে। রাতে একটু ঘুম হলেই ঝরঝরে হয়ে যাবেন কাল।'

শুভ্রদা বলেছিল— 'ভুল নিভা, ভুল ভাবছ। আমি বেশিক্ষণ থাকব না এখানে। নিখিলকেও পালাতে হবে। সারা পশ্চিমবঙ্গে একটা ইঁদুরের গর্তও আমাদের জন্য নিরাপদ নয় এখন। চন্দ্রদা (চারু মজুমদার), সরোজ দত্ত, সুশীতলদা, সুনীতিদারা আন্ডারগ্রাউন্ডে। এ রাজ্যের বাইরে গেলেই বাঁচতে পারব, নাহলে মরতে হবে।'

সেই রাতে খেতে খেতে আমরা তিনজন কথা বলেছিলাম অনেকক্ষণ। রাত তিনটের অন্ধকারে শুভ্রদা

সরীসৃপের মতো আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছিল। আমি নিখিলকে বলেছিলাম— 'তোমার জন্য একটা উৎকৃষ্ট জায়গা আছে আত্মগোপন করে থাকার মতো।'

— 'কোথায়?' — আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিল নিখিল।

— 'কেন? আমাদের দমদমের বাড়ি? সমু এখন কংগ্রেসের যথেষ্ট ইনফ্লুয়েনসিয়েল লিডার। ওর বাড়িতে নক্সাল লুকিয়ে আছে একথা ওর দলের লোকেরাই বিশ্বাস করবে না।'

— 'কিন্তু আমার সেফটির জন্য সমুকে বিপদে ফেলা হবে না তো?'

বলেছিলাম— 'তোমার প্রাণের চেয়ে বড়ো সমুর কাছে অন্য কিছু হতে পারে না নিখিল। আমরা ছদ্মবেশে আজ ভোরেই দমদমে রওনা হবো— ব্যাস্।'

আমি নিজে নিখিলকে দিনমজুরের ছদ্মবেশে এমন সাজিয়ে ছিলাম যে ও আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজেকে চিনতে পারছিল না। ট্রেনে বাসে কোনও বিপত্তি না ঘটিয়ে নির্বিঘ্নে বাড়ি পৌঁছেছিলাম আমরা। সমু বলেছিল— 'তুমি দোতলার ঘরে থাকবে নিখিলদা, নীচে একেবারেই নামবে না। জানালার পর্দা কখনও সরাবে না। দমদম আর নক্সালদের ডেন নেই এখন। বেশিরভাগই পালিয়েছে আর যারা পালাতে পারেনি তাদের তো.... থাক্ ওসব কথা।' — মাথা নীচু করেছিল সমু।

নিখিল মস্করা করে বলেছিল— 'এখন নক্সালদের ধরিয়ে দিতে পারলে শুনছি কংগ্রেসে পদোন্নতি হয়। আমাকে শেলটার দিয়ে তুমি সেই সুযোগ নষ্ট করলে শালাবাবু?'

আহত গলায় সমু বলেছিল— 'যা হচ্ছে সেটা ঠিক হচ্ছে না নিখিলদা। এটা তো গণতন্ত্র বিরোধী কাজ। কিন্তু এখন প্রতিবাদ করা মানেই বিপদ ডেকে আনা। আমি এই নীতি মেনে নিতে পারছি না, কিন্তু স্রোতের বিরুদ্ধে যেতেও পারছি না। আজ তোমার জায়গায় আমি থাকলে তুমি কি করতে আমাকে শেলটার না দিয়ে থাকতে?'

১২টা দিন নির্বিঘ্নে কেটেছিল। ১৩ নম্বর দিনে সমু মুখ গম্ভীর করে বাড়ি এসেছিল। — 'তোমাদের মেদিনীপুরের ঘরে পুলিশ হানা দিয়েছিল। নিখিলদা, রিভলবারটা কেন ফেলে রেখে এসেছিলে? কত বড়ো ভুল যে করলে। তোমরা এখানেও আর নিরাপদ নও। এখন নক্সালদের শুধু আমার দল ধরিয়ে দিচ্ছে না, যে দল ভেঙ্গে তোমরা এসেছিলে ওরাই বেশি ধরাচ্ছে। এই মুহূর্তে পরিস্থিতি খুব খারাপ। ছোটনাগপুরে তোমাদের দু'জনের থাকার ব্যবস্থা করেছি এক আদিবাসী গ্রামে। মাইকা মাইনস্-এর মালিকের স্কুলে পড়াবে। থাকার বাড়ি দেবে, ভাল মাইনে দেবে। পালাতে হবে রে দিদিভাই! আবার ছদ্মবেশ ধরে পৌঁছতে হবে ওখানে। ওই দুর্গম জঙ্গলে কেউ তোদের হদিশ পাবে না। কোলকাতায় থাকলে আমি তোদের বাঁচাতে পারব না।'

বাবা আর মামাও সমুর প্রস্তাবে সম্মত হলেন। নিখিল নিজেও রাজি হয়ে গেল, কারণ রাজি না হয়ে আমাদের আর কোনও উপায় ছিল না। ছদ্মবেশের সাজসরঞ্জাম সমু নিজে যোগাড় করে এনে দিল। মুখে মুসলমানী চাপ দাড়ি, মাথায় লেসের সাদা রংয়ের তক্কি, (টার্কি টুপি), গোড়ালির একটু উপরে সাদা পাজামা আর হাঁটুর নীচে অবদি ঝুলের সাদা কুর্তা পরা নিখিলকে এবারেও চেনা যাচ্ছিল না। আমার জন্য শুধু একটা কালো বোরখা। আমাদের দু'জনকে দেখে মা নিজেই বলেছিল— 'তোদের চেনা যাচ্ছে না রে। সত্যিই মুসলমান মিঞা-বিবি মনে হচ্ছে।' — বাড়ির সবাইকে ভয়ানক আশংকা আর উদ্বেগের মধ্যে রেখে, মা-মামীমাকে কাঁদিয়ে আমরা হাওড়া স্টেশনের দিকে রওনা হলাম। ট্রেনের জেনারেল কামরাকে তখন থার্ড ক্লাস স্লিপার বলা হতো। দু'জনে উঠে ভিড়ের মধ্যে একটু বসার জায়গা খুঁজছি। তখনই যেন ভুঁই ফুঁড়ে এলো পুলিশ বাহিনী। কোনও সন্দেহ প্রকাশ নয়, খোঁজাখুঁজি নয়, একেবারে সোজা আমাদের সামনেই এসে নিখিলের বাহু ধরে ফেললো দু'জন, আর দু'জন মহিলা পুলিশ আমাকে জাপটে ধরল। — 'চল্ শালা নক্সালের বাচ্চা! বেশ বদলে আমাদের চোখে ধুলো দিতে চাইছিলি? এবার দেখ কি করে মাথা থেকে বিপ্লবের ভূত নামাই।'— অত্যন্ত অমার্জিত ভাষায় বললো একজন। সেই বোধহয় অফিসার ছিল।

প্রচণ্ড অত্যাচারে রক্তস্রাব হতে শুরু করলে আমাকে ওরা হাসপাতালে পাঠিয়েছিল। নিখিল কোথায়, কেমন আছে জানতাম না। সমু অনেক চেষ্টায় জামিনে ছাড়িয়ে এনেছিল ওর দিদিভাইকে। বাড়ি এসে মা-মামীমার কান্না-বিলাপ থেকে জেনেছিলাম, আমার আকাশ থেকে নিখিল নামের সূর্যটাকে লগি দিয়ে পেড়ে ফেলেছে শয়তান রুনু গুহনিয়োগীর পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলেছে গর্ভে পালিত একটা অঙ্কুর। একটু সুস্থ হয়েই বলেছিলাম— 'আমি ছোটনাগপুরে চাঁন্দডুংরী যাবো। এই বিষাক্ত শহরে আমাকে জোর করে আটকে রেখো না তোমরা।'

সমু কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। বলছিল— 'তোর এই শরীর-মন নিয়ে এখন আপনজনের কাছে থাকা জরুরি দিদিভাই। আমি তোকে একা কিছুতেই ওখানে যেতে দিতে পারব না। তুই এখনও সম্পূর্ণ সুস্থই হোসনি।'

মানিনি কারও কথা। আমার যা হারিয়েছে সেসব ওরা কেউ তো ফিরিয়ে দিতে পারবে না। তাহলে কেন শুধু আমার শরীরের কথা ভেবে আটকে রাখবে? জোর করে চলে এসেছিলাম। আর এখানে থাকতে থাকতে বুঝেছিলাম এসে ভুল করিনি। এই কোলাহলহীন নির্জন শূন্যতায় নিখিল সারাক্ষণ আমার মনের মধ্যে অবাধে চলেফিরে বেড়িয়েছে, ও আছে আমার সঙ্গে।

— ‘কি হইল? আজকে এতদিন পরে হঠাৎ এই ঘরে আইছস? দেখনের লাইগ্যা আইছস বুড়া বাপটা ৯০ বছরেও মরে না ক্যান?’ — নৃপেন্দ্রনাথ এখনও বাড়িতে মাঝেমাঝে দেশের ভাষায় কথা বলে দেশের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে চান। কথার ধরন শুনলেই সমুর রাগ উঠে যায় মাথায়। ভাষার জন্য নয়, বাবার তীক্ষ্ণ খোঁচামারা কথা সহ্য হয় না বলেই আসতে চান না সমীন্দ্র। মেজাজ সামলে চলতে জানেন, তাই গায়ে না মেখে বিছানায় বসে বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে স্মিত মুখে

বলেন— 'লোকে ঠিকই কয়। বুড়া হইলে মানুষ পোলাপানের ব্যবহার করে। উপরে রোজ আসতে পারি না বইল্লা খুব অভিমান হইছে? তুমারে দেখনের লাইগ্যা তুমার বৌমা আছে, আরও কতজন আছে। কত মানুষের যে কেউ নাই। আমার যে তাগো কাছে যাইতে হয় বুঝো না তুমি? অখন কও, কেমন আছে শরীলটা?'

— 'আমি ভালই আছি, কিন্তু সমু তুই ভাল নাই। তোর কপালে চিন্তার বলিরেখা পড়ছে। নতুন কইর‍্যা কিছু পাওনের আশায় তুই বড় উদ্বিগ্ন। তোর এই চেহারাখান আমি চিনি। কইয়্যা ফালা কি উদ্দেশ্য আছে তোর মনে।'

এইজন্যই সমীন্দ্র আসতে চান না। বাবা যেন থট্ রীডার। চিরকালই এরকম ছিলেন। কথার মোড় ঘোরাবার জন্য বলেন— 'তোমার ডাক্তারের কাছ থেকে খবর পাই তো। একমাত্র বার্ধক্য ছাড়া তোমার কোনও অসুখ নেই জানি বলেই নিশ্চিন্ত থাকি। দেশে থাকতে সব খাঁটি জিনিস খেয়েছ এটা তারই ফল।'

— 'এ্যাই, তুই কথা ঘোরাচ্ছিস? হারামজাদা! দেশ থেকে আসার পর যে রিলিফের দুর্গন্ধ ভাত আধপেটা খেয়ে থেকেছি সে গল্প শোনাইনি তোকে? আমার নীরোগ শরীর আমার সততা, সুস্থ মানসিকতার ফল, বুঝলি! তোর চোখ দেখলেই আমি বুঝি তুই মতলববাজ। নিজের কথা ছাড়া আর কারও কথাই ভাবিস না। তা নাহলে নিভাটার খোঁজ নিস না কেন? একটা মাত্র দিদি বেঁচে আছে না.... ষাঠ্ ষাঠ্... খবর রাখিস তুই? স্বার্থপর কুলাঙ্গার! কতকাল মেয়েটা আসে না, একটা চিঠিও দেয় না। তুই কি করে বুঝবি ওর মনে কতটা অভিমান জমে আছে? আমার প্রাণটা আনচান করে নিভার জন্য, তোর করে না? করবে কি করে? তুই তো এখন আর নিভার ভাই নোস, তুই এখন মাতব্বর নেতা। যা, যা এখান থেকে। আমার খবর নিতে আসতে হবে না তোকে।'

রাগে সমুর মাথা গরম হয়ে যায়। বাবা কি মনে করে আমাকে কে জানে! এখনও চোখ রাঙিয়ে শাসন করতে চায়? দিদিভাইকে বাবা নিজের মেয়ে বলেই ভাবত, দিদির মেয়ে বা ভাগ্নি বলে নয়। সেই সময়ে এক বাড়িতে এক হাঁড়িতে থাকলে ওরকম অনেক সম্পর্ক হতো। কিন্তু সময় তো বদলাচ্ছে। তুতো সম্পর্কগুলোর রং এখন যে কত ফিকে হয়ে গেছে, বাবাকে সেকথা কে বোঝাবে? আপন ভাই-বোনেরই দশ বছরে একবার কারও কথা মনে হয় না, দেখা হয় না, তো মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনের দেখা হওয়া, খোঁজ খবর রাখা তো এই দ্রুত ধাবমান যুগে অসম্ভব প্রায়! বাবা এখনও ৫০-৬০ বছর পিছিয়ে রয়েছে। ঘরের ভেতরে নিজেকে বন্ধ করে রেখেছে বলে বাইরের পরিবর্তনগুলো নজরে পড়ে না। এখন নক্সাল মানেই মাওবাদী। দিদিভাই নিজে হয়ত নক্সালদের সঙ্গে জড়িত ছিল না, কিন্তু ওর স্বামী নিখিল মিশ্রকে কেউ ভুলে যায়নি। আজও নিখিল মিশ্র পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে অমর হয়ে বেঁচে আছে। আমার এই উঠতি সময়ে দিদিভাই যে হুটহাট এবাড়িতে চলে না এসে কতবড় উপকার করছে সেকথা বাবাকে বলা যাবে না। এইসময় নিখিল মিশ্রর বৌ নিভা মিশ্রর খোঁজখবর নিতে আমি তো ঝাড়খণ্ডে যাবো না। ও আমার স্ক্যানারে আছে। ভালই তো আছে। অস্বীকার করছি না যে ও আমার বোন, একটা মাত্র বড়ো বোন। অনেক গভীর বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল আমাদের দু'জনের। দিদিভাইয়ের এখন আমি ছাড়া আর কেউ নেই, এটাও মানি। কিন্তু কি করব? পরিস্থিতি এমন বিষাক্ত হয়ে রয়েছে যে দিদিভাই এখন আমার শত্রুপক্ষ। আমার দিদিটির নিজের কোনও দায়িত্বজ্ঞান নেই মামার খবর নেবার? ধুর.. ছাড়ো! সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। সমীন্দ্রনাথ উঠে বিনা বাক্যব্যয়ে বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

— 'আমি এগুলো পছন্দ করছি না। আমি চাই না আমার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে আতঙ্কবাদী হোক। এসব কাজের পেছনে আদর্শ থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে আদর্শচ্যুত এক শ্রেণীর মানুষ দেশের ক্ষতি করার জন্য বিদেশী আগ্রাসনকারী শক্তিগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আমি তোদের এই শিক্ষা দিইনি। মাও সে তুঙ নামও আমি উচ্চারণ করিনি কখনও।'

— 'না, তুমি দাওনি মা। তুমি তোমার নিজের মতো করে ভেবেছ। অত্যাচার, বঞ্চনা সহ্য করতে শিখিয়েছ। কিন্তু আমরা আর সহ্য করব না।'— সাত্যকি প্রতিবাদ করে। নিভা স্কুলে ভর্তি হবার সময় বাচ্চাগুলোকে সুন্দর নাম দিতেন। সাত্যকির নাম ছিল সাত্তু, কাঁকড়ঈকে উনি কাকলি করেছেন, বাহা-কে বাসব, সাঝাঁকে সন্ধ্যারতি, বুধাইকে বুধাদিত্য— এমনি কত নাম। ওরা কলেজে পড়েছে, গ্র্যাজুয়েট হয়েছে আর অশুভ শক্তির পাল্লায় পড়ে সমাজ শোধরানোর নামে সাধারণ নিরীহ মানুষকে শত্রু বলে মনে করছে, মুখে কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ, মাও সে তুঙ জিন্দাবাদ শ্লোগান দিয়ে। সার্থী বলে— 'কেন মা? তোমার স্বামীও তো একদিন এই আদর্শেই বিশ্বাস করতেন। যারা সেদিন নিখিলবাবাকে খুন করেছিল, তারাই আমাদের খুন করছে। আদর্শচ্যুত কি করে হলাম তবে?'

নিভা আকুলভাবে বলেন— 'ওরে তোরা বুঝতে চাইছিস না কেন, নিখিলরা একটা সিস্টেমের পরিবর্তন চেয়েছিল। ওরা সাধারণ গ্রামবাসী বা সাধারণ মানুষের শত্রু নয়, মিত্র ছিল। ওরা দেশের শত্রু বিদেশী শক্তির কাছে টাকার

জন্য, অস্ত্রের জন্য নিজেদের বিক্রি করেনি। ওরা আতঙ্কবাদী দেশদ্রোহী ছিল না রে। তোদের যারা মাথা চিবোচ্ছে, ওরা ভাল লোক নয় রে। শোষণভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজ সংস্কার কিন্তু এদের উদ্দেশ্য নয়। বিচ্ছিন্নতা এনে দেশটাকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। নিখিলদের ইচ্ছে ছিল একপেশে সিস্টেমের যারা সমর্থক এবং সৃষ্টিকর্তা তাদের শাস্তি দেওয়া। তোদের মতো বিশৃঙ্খলা দমন করতে পাঠানো পুলিশ, আধা মিলিটারির গাড়ি ল্যান্ডমাইন দিয়ে উড়িয়ে দেয়নি ওরা। ওরা জানত, ওই লোকগুলো শত্রু নয়। ওরা জীবিকার টানে চাকরির কর্তব্য পালনে উপরওয়ালার নির্দেশ পালন করে মাত্র। কোনও মানুষকে অকারণ হত্যা করা ওদের উদ্দেশ্য নয়, ওরা নিজেরাও একটা সিস্টেমেরই অঙ্গ। সেই সিস্টেম খারাপ নয় যা দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ব্যবহার হয়। তোরা ওদের মারছিস শয়ে শয়ে। কেন? তোরা কি পুলিশ-সি আর পি এফ— এদের জন্য বঞ্চনার শিকার হয়েছিস যুগযুগ ধরে? আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ, দরিদ্র কৃষকদের শোষণকারীদের বিরুদ্ধে মাও সে তুঙ্গ-এর বিপ্লব। নিখিলরা সেই বিপ্লবে দীক্ষিত বিপ্লবী, আর তোদের লোকে হার্মাদ বলে ডাকছে। ছিঃ!'

সাত্যকি বলে— 'জানি। ওগুলো আমাদের নিজেদের বাঁচানোর কাজ। আমরা না মারলে ওরা আমাদের মারবে। মানছি বিদেশী শক্তির কাছ থেকে অর্থ, অস্ত্র আমাদের নিতে হচ্ছে, কারণ আমরা দেশের ভেতরের চিরন্তন শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নেমেছি। যেদিন যুদ্ধজয় হবে, শ্রেণীশত্রুর পরাজয় হবে, যেদিন দেশের সম্পদে প্রত্যেক দেশবাসীর সমানাধিকার হবে সেদিন বিদেশী সাহায্যের দরকার হবে না।'

নিভা ভাবেন— কত সরল কত সুন্দর ছিল ওরা! আর এখন গেরিলা যোদ্ধা হয়ে ভালমন্দ বিবেচনা না করেই হয়ত বন্ধুকে শ্রেণীশত্রু ভেবে উত্তেজক শিকারের খেলায় উন্মত্ত হয়ে উঠবে। তিনি ওদের প্রভাবিত করে বিপদজনক পথ থেকে ফেরাতে পারলেন না। এই পথেই নিখিলকে হারিয়েছেন, এখন এদেরও? জীবন তাঁর প্রতি বড়ো নির্দয় থেকেছে চিরকাল, তাই এই ছেলেমেয়েদের জন্য ভয় হয় ওঁর।

সার্থী ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকেই আছড়ে পড়ল— 'তুমি নাকি ট্রিটমেন্টের জন্য কলকাতা যাবে ঠিক করেছ মা? আমরা যে ঠিক করলাম ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে যাবো, সেটা বুঝি পছন্দ হলো না? কলকাতায় কে আছে তোমার, যারা আমাদের থেকে বেশি ভালবাসে তোমাকে?'

নিভা মহা ধর্মসঙ্কটে পড়ে যান। অনেক ভেবেচিন্তে চিকিৎসার জন্য নিজের ভাইয়ের কাছে যাওয়াটাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল। এখানে তাঁর ছেলেমেয়েরা যে ব্যস্ত হয়ে সব চেয়ে দামি চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে, সেটা তাঁর অজানা নয়। তাঁর নিজের সামর্থ্য নেই এত টাকার ট্রিটমেন্ট করানোর, তবে সমু তো আছে! কলকাতায় কোনও সরকারি হাসপাতালে কম খরচে হয়ে যেতে পারে বলেই কলকাতা যাবেন ঠিক করেছেন। এখানে তাঁর সন্তানদল এক দেড়লাখ কেন, দরকার পড়লে দশ লাখ টাকাও জোগাড় করে ফেলবে জানেন। কিন্তু সেই টাকার সোর্স যেখান থেকে আসবে তা দিয়ে চিকিৎসা করানোর চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল। ওরা মা'র মন পড়তে পারছে না আজকাল এত অন্ধ হয়ে গেছে। ওদের মা ওদের নিজেদের জিম্মাদারী। তাই মাকে ল্যাজে কেটে কি মুড়োয় কেটে যেভাবেই হোক, সেই দায়িত্ব ওরাই পালন করবে। ওদের অর্গানাইজেশনের কান মুলে টাকা আদায় করে চিকিৎসা করাবে। স্মিত হেসে নিভা বলেন— 'এমন উত্তেজিত হচ্ছিস কেন? আরে, কলকাতায় আমার ভাই আছে তো? ওর কাছেই যাবো। শুধু শুধু ব্যাঙ্গালোরে যাবার কি দরকার বল? তোরা তো দেখছি ভালবাসার অত্যাচার করতে শুরু করলি।'

গম্ভীর মুখে সার্থী বলে— 'তোমার ভাই এম পি সমীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর dossier আছে আমাদের কাছে, in fact প্রত্যেক নেতার dossier-ই আছে। কে কি করে নেতা, এম এল এ, এম পি হয়েছে সবই আমাদের নেটওয়ার্ক খবর রেখেছে। তোমার ভাইকে আমরা বিশ্বাস করি না। স্বার্থের জন্য সব করতে পারে। এবারও মন্ত্রী হবে শুনছি। আচ্ছা মা, তোমার এমন ক্ষমতাবান ভাইকে তোমার খবর রাখতে দেখি না, এখানে আসতেও দেখলাম না কখনও। তাও তুমি ওর কাছেই যাবে? আমরা তোমার দেখাশুনো, সেবাযত্ন করতে পারব না?'

— 'না রে! অনেককাল যাই না, দেখতে ইচ্ছে করে তাই। তোরা যেভাবে আমার যত্ন করিস সে তো পেটের ছেলেমেয়েও বোধহয় পারবে না। ওসব কথা মনেও আনিস না। আসলে, মামার জন্য মনটা বড়ো উতলা হয়েছে, বেঁচে আছেন কিনা তাও জানি না। নব্বইয়ের ওপর বয়স। তোরা আমাকে যেতে দে মা। আটকাস না আমাকে।'

সার্থী বলে— 'বেশ, কলকাতায়ই যাবে, কিন্তু আমাদের নজর সারাক্ষণ থাকবে তোমার ওপর।'

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন নিভা— 'তোরা আমাকে নজরবন্দী করে রাখবি? কেন রে? এর মানে কি তাই তো মাথায় ঢুকছে না। কি করেছি আমি?'

— 'তুমি কিছু করনি মা। কিন্তু তুমি নিখিল মিশ্রর স্ত্রী। তুমি জীবনের চল্লিশ বছর আদিবাসী উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করে আমাদের একজন হয়ে এখানে থেকে গেছ। গভর্ণমেন্ট এখন

With Best Compliments From:

emami

EMAMI PAPER MILLS LIMITED

AN ISO 9001 : ISO14001 : OHSAS 18001 CERTIFIED COMPANY

Manufacturers of

HIGH QUALITY WHITE AND PINK NEWSPRINT

S.S. Maplitho Paper, Writing & Printing Paper,

Ledger Paper, Duplicating Paper, etc.

*
**
****

Registered Office:
687, Anandpur, E.M. ByePass, 4th floor, Kolkata-700107(West Bengal)
Phone: 6613-6264, Fax : (033)6613-6400
E-Mail: emamipaper@emamipaper.in

Unit Gulmohar
R. N. Tagore Road,
Alambazar, Dakshineswar
Kolkata 700035(West Bengal)
Phone: 2564-5412/5245/
6540 9610-11 Fax : (033)2564-6926

E-mail : gulmohar@emamipaper.in

Unit Balasore
Vill: Balgopalpur
P.O.: Rasulpur,
Dist. Balasore(Orissa) –756020
Phone: (06782)275-723/779
Fax: (06782)275-778

E-mail : balasore@emamipaper.in

*****
***
*

আর নক্সাল আর মাওবাদীদের মধ্যে কোনও তফাৎ দেখছে না। গুয়ে-গোবরে এক নজরে দেখছে। এখন গভর্ণমেন্টয়ের বিরুদ্ধে একটি কথা বললেই মাওবাদী হয়ে যাচ্ছে লোকে। আর আমরা তো একেবারে হার্মাদ! সে কথা তুমিও বল, আমরা আদর্শচ্যুত হার্মাদ। কিন্তু মা-গো, এই বন্য ছেলেমেয়েদের নিজের কোলে বসিয়ে অক্ষর শিক্ষা দিয়েছ তুমি, নিজের ঘরে রেখে শেলী, কীটস্, বায়রন, শেক্সপিয়ার পড়িয়ে শিক্ষিত করে তুলেছ। তুমি কেন বোঝ না মা, তুমি দুনিয়ার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখলেও তোমার এই সিস্টেম নিশ্চয়ই তোমার খবর রাখে? বিশেষ করে তোমার ভাই।'

— 'পাগলী! আমি কোথাকার কে বল তো? আমার তো কোনও অস্তিত্বই নেই যে খবর হবো।'

— 'তুমি ওই সুখেই মজে থাকো। যাক্ গে। তোমাকে বোঝানো যাবে না। কোলকাতায় তোমার যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, সেজন্য সারাক্ষণ তোমাকে চোখে চোখে রাখা হবে।'

— 'তুই সত্যি পাগল। আমার ভাই থাকতে আমার ক্ষতি কে করবে? আমি তো ওর বাড়িতেই থাকব রে!'

— 'সেসব তুমি বুঝবে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে তোমার নিরাপত্তার কথা আমাদের ভাবতে হচ্ছে।'

সার্থী নিভাকে জড়িয়ে ধরে বলে— 'এনজিওগ্রাম-এ যেন ধরা পড়ে যে তোমার বাইপাস অপারেশন করতে হবে না। ওষুধেই ঠিক হয়ে যাবে তুমি। তাড়াতাড়ি চাঁন্দডুংরীতে ফিরে এসো মা।'

নিভার চোখে জল আসে। সার্থীর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলেন— 'হৃদয়ে এত মমতা এত ভালবাসা নিয়ে হাতে কালাশনিকভ তুলিস কি করে মা?'

সার্থী উত্তর দেয়— 'তোমার ওই গলিত শবের মতো 'সিস্টেম' বাধ্য করেছে মা।'

সমুর সল্টলেকের বাড়ির কথা কোনও এক খবরের কাগজে পড়েছিলেন। ঠিকানাও জানা ছিল না। অবাক হয়েছিলেন যখন কাঁকড়ী বলেছিল— 'আমাদের কাছে এ্যাড্রেস ডাইরেক্টরি আছে ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'— ব্যাগে এখানকার মেডিকেল রিপোর্ট, ওষুধ ভরতে ভরতে বলেছিল ও। এ সি কামরায় প্রথম চাপলেন। একটা মাত্র ব্যাগ, তাও হাল্কা। ওরা ক'জন এসে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। সামনের বার্থের কালো মতো মেয়েটাকে বলেছিল— 'একা যাচ্ছেন, একটু দেখবেন।'— এক রাতের জার্নি, তাও ওদের চিন্তা। সামনে বসা মেয়েটা বিছানা করে দিয়ে বলল, — 'শো যাইয়ে।' — ব্যাস্, আর কথাই বললো না। সকালে হাওড়ায় পৌঁছতেই নিভার ব্যাগ আর নিজের ব্যাগ হাতে নিয়ে বললো— 'চলিয়ে। ম্যায় আপকো ট্যাক্সি মে বৈঠা কে যাউঙ্গী।'

নিভা আপ্লুত হয়ে বললেন— 'না- না, এর দরকার হবে না। আমি নিজেই ওটা নিতে পারব।'

মেয়েটা শুনল না। তাঁকে ট্যাক্সিতে বসিয়ে দেবার আগে ট্যাক্সির নম্বর লিখল নোটবুকে। তখন নিভা বুঝলেন এই মেয়ে তাঁর প্রোটেকশন হয়ে এসেছিল ট্রেনে।

কলকাতা চলমান হয়ে জানালার পাশ দিয়ে সরে যাচ্ছে, যেন নতুন দৃশ্য দেখাবে বলে। কত পরিবর্তন! কত রকমের বাস চলছে। আগে লাল স্টেটবাস আর কিছু প্রাইভেট বাস চলত। রাস্তাঘাটও অচেনা মনে হচ্ছে। একের পর এক ফ্লাইওভার পেরিয়ে কোথায় যে এসে পড়ছেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। সল্টলেক উনি দেখেনইনি, শুধু শুনেছেন নতুন সিটি তৈরি হচ্ছে বলে। নিভা চারপাশের উন্নয়ন দেখতেই নিমগ্ন হয়েছিলেন। ড্রাইভারের কথায় সজাগ হয়ে উঠলেন। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল— 'মাতাজী, বাৎ ক্যা হ্যায় বোলিয়ে তো? মোটরবাইক সে সওয়ার দো আদামী হাবড়া সে মেরা ট্যাক্সিকা পিছা কর রহা হ্যায়? আপ হ্যায় কৌন? ইয়ে লোগ কিঁউ পিছা কর রহা হ্যায় জী? কোই খত্‌রা তো নহী হোগা? ম্যায় ঝুটমুট ঝমেলা মে পড়না নহীঁ চাহতা। আপকো সামনে উতার দেতা হুঁ, দুসরা ট্যাক্সি লে লিজিয়ে।'

নিভা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন যে ওরা সত্যিই তাঁকে চোখে চোখে রাখছে কেন এত সুরক্ষার ব্যবস্থা সেটাই রহস্য। গম্ভীর গলায় ড্রাইভারকে বললেন— 'বেটা, আপ যবতক্ চলতে রহোগে আউর মুঝে মঞ্জিল তক্ পৌঁছাওগে তবতক্ কোই ঝমেলা নহী হোগা। বো দো আদামী মেরে সাথই হ্যায়। মেরা অঙ্গরক্ষক কহ সকতে হো। ম্যায় এক মন্ত্রি মহোদয় কা বড়ী বহন হুঁ। অব চলতে রহো, রোকো মৎ।' — ড্রাইভার আর কথা বাড়ায় না, নিভা পেছন দিকে দেখেন। হেলমেটের আড়ালে ঢাকা মুখ দেখা যায় না, কিন্তু ওই বাইক ট্যাক্সি ফলো করছে এতক্ষণে সেটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়।

ড্রাইভার তাঁকে একেবারে সঠিক ঠিকানায় এনে নামালো। পাশ দিয়ে মোটরবাইকও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচার মতো হুশ করে বেরিয়ে গেল। আনমনা নিভার মনে একটাই প্রশ্ন খোঁচাচ্ছে সারাক্ষণ। কেন এত প্রটেকশন দিয়ে সমুর বাড়ি অব্দি নিয়ে এলো তাঁকে? কিসের ভয় ওদের মনে? ৭০-এর সেই বিপদজনক সময়ে তো একা একাই বিপদের মোকাবিলা করেছেন। এখন ওঁর আর কিসের ভয়? সার্থীর দুশ্চিন্তার কোনও ভিত্তি আছে কি? ওগুলো একেবারে অমূলক বলেই

With Best Compliments
from :

R. C. Bhandari

36, Basemant,
8, Camac street
Kolkata–700017

With Best Compliments
From :

Parag Finance
(P) Ltd.

36, Basement
8, Camac Street
Kolkata–700017

TRADE
CENTRE
(INDIA)

37, Lenin Sarani
Kolkata - 700 013

e-mail : t.c.india@vsnl.net

Fax : 91-33-2249, 8706
Ph. : 2249-8722

Phone : 2242-9915

Trade
Field

For Paper &
Paper Accessories

2/1, Synagouge Street
Kolkata - 700 001

মনে হয়।

মামা নিভাকে দেখেই আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে উঠল— 'নিভা, নিভা রে, মা আমার! শেষপর্যন্ত মামাটারে মনে পড়ল তোর? আমার প্রাণটা যে তোরে দেখার লাইগ্যা ছটফট করতাছিল। মরণরেও আটকাইয়্যা রাখছি তোর লগে দেখা না হওয়া পর্যন্ত মরুম না বইল্লা। আয়, আমার কাছে আয়। আগে দেখি মুখখানা ভাল কইর‍্যা। — ঈশ্! কি চেহারা বানাইছস্ ক দেখি?'

নিভা মামাকে প্রণাম করে পাশে বসে বলেন— 'কেন মামা? আমি তো ভালই আছি। বয়সটা কি কম হলো তোমার মেয়ের? এই বয়সে এরকম চেহারাই হয়। তুমি কেমন আছো আগে বল।'— কি শান্তি! অবশেষে আপনজনের সান্নিধ্যে আসার কি সুখ!

মামা বললেন— 'আমিও খুব ভালো আছি। দেখতাছস না, কি রাজকীয় ব্যবস্থায় নব্বই বছর বয়সে বাস করতাছি? কয় জনে বুড়া বয়সে এইসব পায়? আমার জীবনে অনেক পাপ রে নিভা, সহজে মরুম না আমি। পাপের যন্ত্রণা বুকে লইয়্যা বাইচ্যা থাকুম একশো বছর।'

নিভা হেসে ফেলে বলেন— 'তুমি আর পাপ? নর্থপোল-সাউথপোল একটা পয়েন্টে আসে না মামা। সারা জীবনে একটা মিথ্যে কথা বলতেও কেউ শোনেনি তোমাকে। তোমাদের মতো মানুষকেই তো ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বলে। আমাকে বলো তো তোমার মনে অকারণ কিসের এত যন্ত্রণা?'

নৃপেন্দ্রনাথ ধীর গলায় বলেন— 'নিভা, আমার নব্বই বছর বয়স হয়েছে কিন্তু ভীমরতি হয়নি রে। ভাবনা-চেতনায় ছানি পড়েনি, একেবারে স্পষ্ট, স্বচ্ছ রয়েছে। নিজে পাপ না করলেও অন্যের পাপ জেনেশুনে চেপে রাখাও পাপই হয়। তোর সঙ্গে আমার কথা আছে। নিভৃতে বলব তবে বুঝবি আমি কি যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে আছি তোর অপেক্ষায়। তোকে না বলে মরতেও যে পারব না।'

চিত্রা খুব ভাল বৌ হয়েছে। একেবারে এই পরিবারের উপযুক্ত। যেন মা আর মামীর মিশ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ। বড়ো ননদ এতকাল পর এসেছেন, তাতে ওর আনন্দ যে অকৃত্রিম নয় সেটা এসেই বুঝেছিলাম। বললো— 'তুমি খুব ভাল সময়ে এসেছ, তোমার ভাই এখন এখানে আছে। কত গল্প শুনেছি তোমাদের ভাই-বোনের ভালবাসার, বন্ধুত্বের, এবার স্বচক্ষে দেখব। দিদিভাই, এতবড় এই বাড়িটাতে তোমার নিজেরও অধিকার আছে, তাহলে তুমি কেন এই বয়সেও বাইরে একা একা থাকো বল তো? আমি কিন্তু সবসময় চেয়েছি তুমি এসে আমাদের সঙ্গেই থাকো। সেটা কি করা যায় না?'

চিত্রাকে কি বলব আমার হার্টের প্রবলেমের কথা? এখানে সমুর সাহায্যে চিকিৎসা করাতে এসেছি এটা এখনই ওকে বলা কি ঠিক হবে? না, থাক। সমু সন্ধ্যের সময় এসে পড়বে, তখন দু'জনের সামনেই বলব। চিত্রা বলল, এবাড়িতে আমার অধিকার আছে। ক'জন বৌ ননদকে একথা বলে? অধিকার থাকলেও দিতে চায় না। সমুই নিশ্চয়ই বৌকে সব কথা বলেছে। বাবার মৃত্যুর পর যখন দমদমের বাড়িতে এসেছিলাম, তখন মামা দমদমের বাড়ি আমাদের দুই ভাইবোনকে সমান অংশীদার করে উইল করতে চেয়েছিলেন। কারণ বাবা জমির পাট্টা নিজের নামে না করিয়ে মামার নামে করেছিলেন। মামা সে কথা ভোলেননি। আমি নিজেই আপত্তি করেছিলাম অংশ নিতে। ছিঃ ছিঃ! একটা মাত্র ভাই, তার সঙ্গে ভাগ-বাঁটোয়ারার সম্পর্ক কখনও মেনে নেওয়া যায়? সমুর থাকলে আমারও তো থাকলই! আমি তো এখানে বসবাস করব না। হয়ত কখনও আসব ক'দিনের জন্য। সে তো ভাইয়ের কাছেই আসব। শুধু দমদমের বাড়ির অংশ কেন কোনও কিছুরই তো আর মূল্য ছিল না আমার কাছে। আজ চিত্রাই বললো যে সমু দমদমের বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছে। শুনে প্রথমে বুকে একটু ছলাৎ করে উঠেছিল বটে, কারণ ওই বাড়িতে আমাদের কত স্মৃতি জড়িয়ে ছিল। পরক্ষণেই মনে হয়েছে— বেশ করেছে বিক্রি করে। সমুর দুই ছেলেই আমেরিকায়। দমদমের ওই বাড়িটা ওদের অন্তত পছন্দ হতো না মোটেই। কী চমৎকার বাড়িখানা করেছে সমু সল্টলেকে! ওর দুই ছেলে, আমি, আরও পাঁচজন এলেও হাত পা ছড়িয়ে থাকার অসুবিধা হবে না। চিত্রার কথা থেকেই বোঝা যায় ভাই যতবড় মাপেরই হোক না কেন দিদিভাইয়ের স্থান ওর মনে একই জায়গায় আছে এখনও। ও এলে ওকে আমার মেডিকেল রিপোর্টগুলো দেখিয়ে বলব সরকারি হাসপাতালেই ব্যবস্থা করবি। বড়ো নার্সিংহোমে করলে আমি যাবো না কিন্তু।

চিত্রার হাতে হাত রেখে বললম— 'তুমি এত আন্তরিক ভাবে বললে তাতেই আমার সব পাওয়া হয়ে গেল চিত্রা। এখন আর স্থানচ্যুত হতে চাই না। কয়েকটা দিনের জন্য এসেছি। ফিরে যাবো ওখানেই। ওটাই এখন আমার জায়গা।'

রাত্রে বাড়ি ফিরে দিদিভাইকে দেখে সমীন্দ্রনাথ ছেলেমানুষ হয়ে যান নিমেষে। রোগা বোনকে এক ঝটকায় কোলে তুলে একপাক ঘুরিয়ে মাটিতে নামান। চিত্রা হেসে কুটি কুটি হয়ে বলে— 'এই অবস্থায় তোমার চ্যালারা একবার তোমাকে দেখতে পেলে ভাল হতো। কি দিদিভাই, এমন ভাইকে ফেলে আবার চলে যেতে পারবে তুমি?'

— 'কে যাবে? কোথায় যাবে? কোত্থাও আর যাওয়া-টাওয়া হবে না তোর। এখানে থাকতে হবে এখন। রোজ রোজ বাবার গালাগাল শুনে জীবনে বিতৃষ্ণা এসে গেল তোর জন্য। তুই জোর করে ওখানে থাকতে গেলি, সেটাও আমারই দোষ। না, আর তোমার বনে গিয়ে বন্য হওয়া হবে না, বলে দিলাম। এখন আর একা থাকার বয়স নেই তোমার। ওখানে এখন তোর থাকাও বিপদজনক।'

নিভার চোখে জল এসে যায়। এই তো সমু, সেই ছোটবেলার সমু, আমার ভাই। এত টান, এত ভালবাসা গোপনে সঞ্চয় করে রেখে দিয়েছে দিদিভাইয়ের জন্য, দেখা হলে উজাড় করে ভাণ্ডার খালি করে দেবে বলে। —'ওরে, সেসব পরে ভাবা যাবে। এখন শোন, আমার একটা জরুরি প্রয়োজনে ছুটে আসতে হলো। আমার....

— 'ওসব প্রয়োজন পরে হবে, পরে শুনব। আগে তোর কথা বল। চাঁন্দডুংরী ছাড়বি তো? ওখানে তো মাও-রা সারাক্ষণ খাও খাও করছে। তুই আছিস কি করে রে? তোকে না কিছু করে ফেলে আমার সেটাই চিন্তা হয়। দিদিভাই, কথা দে, আর ফিরে যাবি না! তোকে মারতে মাওদের একটা গুলিও খরচ হবে না। যা চেহারা স্বাস্থ্য করেছিস, একটা ঠ্যালা মারলেই পড়ে মরে যাবি। — চিত্রা, ডায়েটিশিয়ানকে খবর দাও, দিদিভাইয়ের চার্ট বানিয়ে দেবে।'

— 'সমু, এসব আজেবাজে কথা রাখ না। মাথার চুলগুলোই সাদা হয়েছে, স্বভাবে ছেলেমানুষই তো রয়ে গেছিস। বলছি আমার একটা বিশেষ দরকার আছে....'

— 'সমীন্দ্রনাথের কাছে একশোজন রোজ নিজের দরকারে আসে, কেউ খালি হাতে ফিরে যায় না। আর তুই আমার নিজের দিদি, তোর দরকার ফার্স্ট প্রায়োরিটি। যা বলবি সব করে দেব। তবে, রাত্রে এই সময়টা আমি ওসব শুনি না, সকালে বলিস। এখন খেতে খেতে জমিয়ে আড্ডা মারব তোর সঙ্গে। ... আচ্ছা, চাঁন্দডুংরী তো মাও মিনেসের (Menace) ডেন, এক্কেবারে ব্রিডিং গ্রাউন্ড। তুই এতকাল ধরে ওদের ঘরের মানুষ হয়ে রয়েছিস, চোখের সামনে দেখছিস, আমাকে কিছু ইনফরমেশন দে না!'

প্লেটের ওপর নিভার হাত থেমে যায় নিথর হয়ে, মুখের খাবার যেন গলায় আটকে যায়। এক ঢোক জল খেয়ে সামলে নিয়ে বলল— 'তুই আগে জানালে না হয় ইনফরমেশন জোগাড় করে রাখতাম। আমি তো প্রফেশনাল ইনফরমার নই যে চোখ-কান মাটিতে পুঁতে চলব? গ্রামের ভেতরে তো কিছুই হতে দেখিনি। যেমনকার তেমনই চলছে। চাঁন্দডুংরী যে মাওবাদের ব্রিডিং গ্রাউন্ড একথাও তোর মুখে শুনছি। তাছাড়া জায়গাটা এখনও এত অনুন্নত হয়ে আছে যে তিনদিনের বাসি কাগজ আসে এন জি ও-তে। ওরা পড়ে আমাকে পাঠায়। হ্যাঁ, মাও মিনেস (Menace) নিয়ে পড়েছি বটে, তবে গ্রামে কোনও প্রভাব দেখিনি রে। কি খবর দেব তোকে?'

— 'উঁম্। নিজের গ্রামে হয়ত কিছু করে না তবে দেশের এক নম্বর শত্রু এখন আর জিহাদিরা নয়, এই মাওবাদী হার্মাদগুলো হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুই সাত্তু বলে কাউকে চিনিস? মানে, তুই তো ওদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করেছিলি, তোর ছাত্রদের মধ্যে সাত্তু নামে কেউ ছিল? মনে করে দেখ তো। ব্যাটাচ্ছেলে রাঁচি ইউনিভার্সিটি থেকে সোসিয়েল সায়েন্স পোস্ট গ্র্যাজুয়েট। ওই মাইকা মাইনস্ অঞ্চলের মাও নেতা হলো এই সাত্তু ওরফে সাত্যকি মুণ্ডা। ঝাড়খণ্ড থেকে বেঙ্গল পর্যন্ত ওরই দাপট।'

নিভার বুকের গভীর কান্নার শব্দ— সাত্তু রে! আমার সাত্যকি! সাবধান বাবা, তোর সামনে অন্ধকার খাদ। বলেন— 'দাঁড়া, আমাকে ভাবতে দে। সত্তরের আশপাশে বয়স হলো, কিছু আর মনেও থাকে না ছাই! আর, সাত্তু, সিধু, বুধাই এসব নামগুলো ওদের মধ্যে এত কমন না যে প্রত্যেক পাঁচজনে একজন ছেলের ওই নাম থাকে। আমার স্কুলের ছাত্র হলেও হতে পারে। কবেকার কথা এখন কি আর অত মনে থাকে? দেখলেও চিনতে পারব না। ছাড় না বাপু, ওসব মাও-ফাও কথা! নিজেদের কথা শুনি এখন। তোদের ছেলেদের কথা বল।'

চিত্রাও সাপোর্ট করে বলে— 'যা বলেছ। বাড়ির খাবার টেবিলে এসব কথা ভালো লাগে না। তাছাড়া দিদিভাই শান্তিপ্রিয় মানুষ, উনি এই বয়সে মাও কালচার করবেন নাকি তোমার জন্য?'

— 'আমার জন্য নয় চিত্রা, দেশের মঙ্গলের জন্য। দিদিভাইকে তুমি আজ প্রথম দেখলে, আর ও আমার হাত ধরে স্কুলে, খেলার মাঠে, মেলায় নিয়ে যেত। আমার দিদিটাকে আমি চিনি। জিজ্ঞেস করেছিলাম যদি কিছু সুলুক সন্ধান পাই সেজন্য। তবে ও জানলেও যে বলবে না সেটাও আমি জানি। ও আমার বাবার মতোই দুর্লভ আর একজন সৎ মানুষ। ওদের জন্য আমার মনেও কিন্তু গর্ব আছে চিত্রা! .. তবে এই অনেস্টিকে আমি কিন্তু বোকামি ভাবি।'

পরদিন সকালেও সমুকে নিজের ট্রিটমেন্টের কথা বলার সুযোগই হলো না। দুপুরে বন্ধু মঞ্জুরীর বাড়িতে এলেন নিভা। তাঁর আর নিখিলের মাঝখানে সেতু বন্ধন করেছিল মঞ্জুরী আর ওর দাদা শুভ্র। মেয়েটা নিজে বিয়ে করে সংসারী হলো না, শুভ্রদাও না। এত যুগ পরে নিভাকে দেখে মঞ্জুরী যেন অমাবস্যায় চাঁদ দেখলেন— 'ওরে তুই এখনও বেঁচে বর্তে আছিস! আমি তো ভাবছিলাম নিভাটা মরবার পরে জানালোও না ওরে আমি মরে গেছি!'— বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলোর মতো দুই প্রৌঢ়া খিলখিল করে হাসতে লাগলেন। মঞ্জুরী

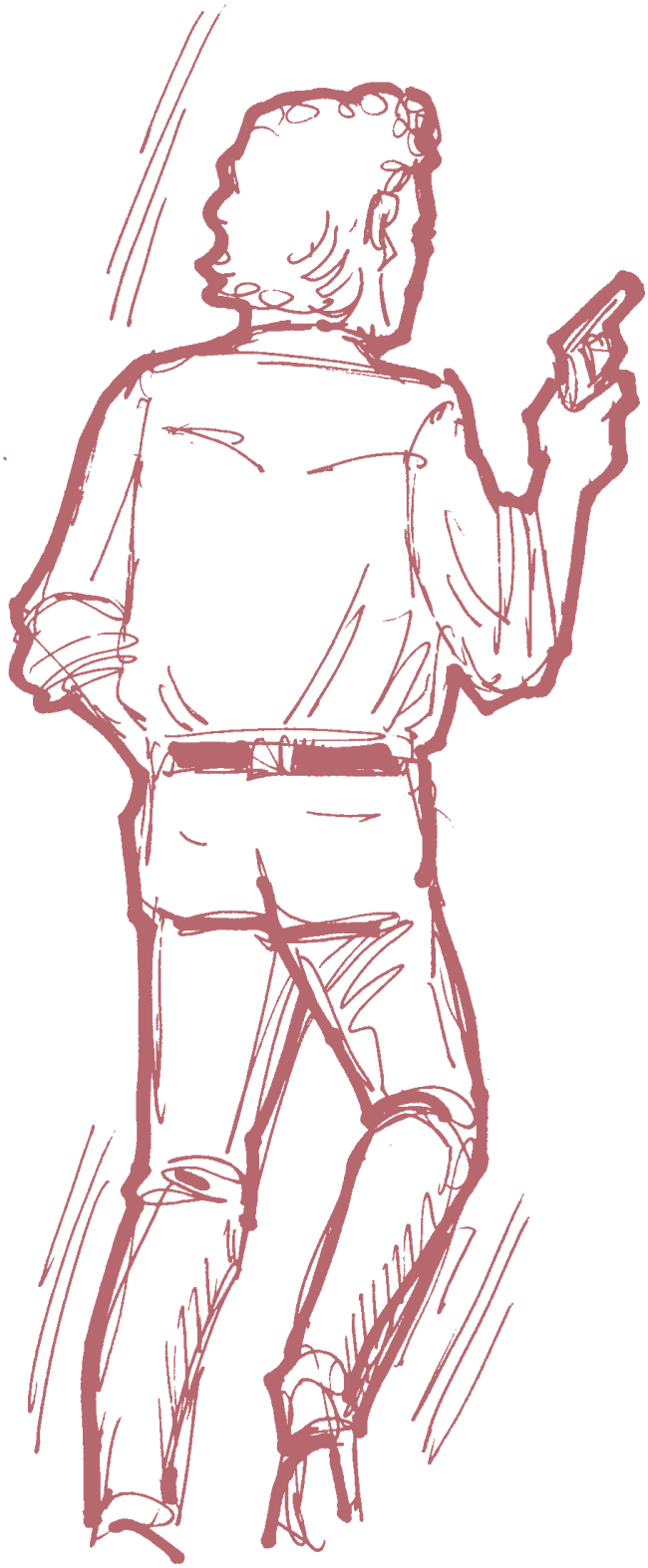

বললেন— 'দাদাও এসেছে নিভা। চল, ও ঘরে আছে।'

মেদিনীপুরের সেই অন্ধকার রাতের পর আজ দেখা হলো শুভ্রদার সঙ্গে। কথায় কথায় নিখিলের প্রসঙ্গ এসে পড়ল। শুভ্রদা বলল— 'নিখিল আর আমি চন্দ্রদার সঙ্গে মানে চারু মজুমদারের ছদ্ম নাম ছিল চন্দ্রকুমার রায়, দেখা করতে যেতাম একসঙ্গে। শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় এলে চন্দ্রদা যেসব গোপন ঠেকে থাকতেন সবগুলোই আমাদের গম্য ছিল। খুব ভালবাসতেন আমাদের। চন্দ্রদা-ই আমাদের একই স্বপ্ন দেখাতে শিখিয়েছিলেন। নিখিলের মৃত্যু ঘিরে অনেক প্রশ্ন জেগেছিল মনে, উত্তর খুঁজে পাইনি আমরা। — নিভা, মেদিনীপুরে সেই রাতের পর তোমরা দমদমের বাড়িতে কেন এসেছিলে?

নিভা বললেন— 'কারণ, আমার ভাই সমু সেই সময় ক্ষমতা থাকা পার্টিতে প্রায় নেতার স্তরেই ছিল। পুলিশ কক্ষনো সন্দেহ করবে না যে ওই বাড়িতে নিখিল শেলটার নিয়েছে তাই। সমু অনেক রিস্ক নিয়ে কত সাবধান যে রেখেছিল নিখিলকে, আমি তো সাক্ষী শুভ্রদা। ওর নিজের পলিটিক্যাল ক্যারিয়ারের কথাও ভাবেনি সমু।'

— 'হুম। আচ্ছা, তোমরা যে সেদিন ছোটনাগপুরে যাচ্ছ, হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরবে, এসব কথা কাউকে বলেছিলে? ছোটনাগপুরে যাওয়াটা কি তুমি আর নিখিল মিলে ব্যবস্থা করেছিলে?

— 'না। মোটেই না। সমু বলেছিল, একমাত্র আমরা বাড়ির ক'জন ছাড়া কাকপক্ষীতেও যেন না জানে। অত্যন্ত গোপন রাখা হয়েছিল কথাটা। সমু-ই ছোটনাগপুরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিল।'

— 'বাড়ির কেউ মানে তোমার মা বা সমুর মা মুখফস্কে পাড়ায়....'

— 'অসম্ভব! মা আর মামীমা কারও সঙ্গে মিশতই না। যেখানে একমাত্র মেয়ে-জামাইয়ের প্রাণ সংশয় হতে পারে... অসম্ভব শুভ্রদা।'

— 'তাও তো বটে। আচ্ছা, তোমরা তো শুনেছি মুসলমান মিঞা-বিবির ছদ্মবেশে ছিলে। সেই ছদ্মবেশ যার দোকান থেকে নিয়েছিলে সেও তো খবর দিতে পারে!'

— 'ছদ্মবেশ সমু নিজে নিয়ে এসেছিল। দোকানদার কি করে জানবে ওগুলো আমরা দুজনে পরবো। সে আমাদের চিনবেই বা কি করে? না শুভ্রদা, ওসব কিছু নয়। পুলিশই আমাদের চিনতে পেরেছিল। সমু নিখিলকে নিজের হাতে নিখুঁত ছদ্মবেশ করিয়েছিল। এমন নিখুঁত যে মা-বাবা, মামা-মামীও বলেছিল নিজেদের জামাই না হলে আমরা বুঝতেই পারতাম না। কিন্তু পুলিশের চোখ ফাঁকি

দিতে পারিনি আমরা। সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য।'

— 'আমার আর কোনও প্রশ্ন নেই নিভা। একটা রহস্য দলের সবাইকে ভাবাচ্ছিল, তাই প্রশ্ন করলাম। এবার বল, ওখানে আছো কেমন?' — প্রসঙ্গ বদলে সাধারণ কথায় এল শুভ্রদা।

আজ পার্টি অফিসে কিন্তু আবহাওয়া বেশ মনোরম। বর্ষীয়ান নেত্রী সকলের শ্রদ্ধেয়া মালা মজুমদার প্রথমেই সমীন্দ্রনাথকে আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন, — 'বিজয়ী ভব। যা রটে তা যেন সত্যিই ঘটে এক্ষেত্রে। পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস যেন শির উন্নত করে উঠে দাঁড়াতে পারে। তোমার ক্ষুরধার কূটনৈতিক বুদ্ধি, সময় এবং সুযোগ সদ্ব্যবহারের বিচক্ষণতা, দূরদৃষ্টি, সবই বয়সের থেকে আগে এগিয়ে এনেছে তোমাকে। আজ যা ঘটবে বলে শোনা যাচ্ছে, তা ঘটলে বাংলার গৌরব বাড়বে সমীন্দ্র। তুমিই একেবারে সঠিক ব্যক্তি এই পদের উত্তরাধিকার হবার জন্য। ... তবে বাংলা চিরকাল তো ঠগের বাড়ির নেমন্তন্ন খেতে গেছে, তাই না আঁচালে বিশ্বাস নেই।'

আজ অরুণ নিয়োগীর গলায়ও শ্লেষ নেই। খুশি মুখেই বলল— 'এটা আমাদের রেকর্ড যে আজ অবধি কোনও বাঙালী নেতা সে তিনি যে দলেরই হোন না কেন, কোনও স্ক্যামে জড়িয়ে পড়ার মতো লজ্জাজনক পরিস্থিতি তৈরি করেননি দেশের সর্বপ্রাচীন পার্টির জন্য। কিছু মনে করবেন না, এখানে আমরা সকলেই একই মতাদর্শে আস্থা রাখি এবং এই ঘরের ভেতরে একান্তে এক সাধারণ নাগরিক হিসেবে বলছি, এত বড়ো মাপের প্রথম সারির একজন পলিটিক্যাল লিডার হয়ে উনি যেভাবে নিজেকে কলঙ্কিত করলেন, তাতে আগত জেনারেল ইলেকশনে আমাদের পার্টির ইমেজ কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে, এই বলে রাখলাম। ছিঃ ছিঃ! একটার পর একটা দুর্নীতি! লোকসমাজে মুখ দেখাতে পারা যায় না। সেই বোফর্স থেকে শুরু হয়েছিল, আর থামার নাম নেই। লোকে আমাদের চোরের পার্টি বলে হাসাহাসি করে, জানেন?'

সমীন্দ্র মনে মনে বলেন— 'শালা তুইও তো চোর। কেবিনেট মিনিস্টার হলে লাখ লাখ কোটি টাকার স্ক্যাম করতিস। রাজ্যে থেকেই ইরিগেশনের টাকা তছরূপের দায় তোর মাথায়। বড়ো বড়ো বুক্‌নি মারছিস!'

বর্ষীয়ান নেত্রী মালা মজুমদার মুখ কাটা একজন অত্যন্ত সৎ মানুষ হিসেবেই পরিচিত। কারুর তোয়াক্কা করেননি কোনওদিন। রাজনীতি করছেন ষাট বছর ধরে, বয়স একাশী বছর। বললেন— 'শোনো হে, ২১ বছর বয়স থেকে কংগ্রেস করছি, তোমাদের অনেকে তখন হয়ত জন্মাওনি। মানুষের ঠিকুজীতে ১২টা রাশি থাকে, তার মধ্যে একটা হলো লগ্ন। লগ্ন কাকে বলে বলে দিই। লগ্ন হলো একজন মানুষের দেহ-মন-অস্তিত্ব, মানে সবকিছু। লগ্নে দোষ থাকলে মহাসঙ্কট, কারণ সেটা কাটানো প্রায় অসম্ভব। স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের পার্টির লগ্ন দোষ ধরা পড়ল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের স্রষ্টারা প্রয়াত হয়েছেন। লগ্নদোষে দুষ্ট পার্টি কারও কারওকে প্রয়াণ করতে বাধ্য করেছে ক্ষমতা মুষ্ঠিবদ্ধ রাখার জন্য। দিনে দিনে অসুস্থ লগ্ন ক্ষীণতর হয়েছে, তবুও এই পার্টিটাকে ত্যাগ করতে পারিনি। কারণ ওটা যে একজন কংগ্রেসী হিসেবে আমারও লগ্ন। ষাট বছরে বহু নোংরামী দেখেছি। তখন ওসব এমন করে প্রকাশ হতো না বলে পাবলিক জানত না। লগ্ন দুর্বল, তাই উত্তরণ তো ঘটবেই না! শুধু অধঃপতন হবে। যদি উত্তরণই হতো হে, তাহলে কি আর নিজের দেশের রাশখানা আবার বিদেশীর হাতে তুলে দিতাম? দেশে আর একটাও কেউ ছিল না রাশ ধরার জন্য? যাকে দিলাম সে আমাদের কতটুকু জানে? তার কেন টান থাকবে এদেশের নদী-নালা, পাহাড়-তরাই, গামছা পরা শ্রমিক-কিষাণ, নেংটি পরা আদিবীসদের ওপর? সে কিছু বোঝার আগেই তো আমরা ওর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছি রাজকোষের দরজা খুলে দেখিয়ে। দেখ হে, সেই গজনীর মহম্মদ ঘোরী থেকে দেশের সম্পদ লুঠ হচ্ছিল— এখনও হচ্ছে। ওরা হাল্লাবোল বলে লুঠ করত আর এরা গোপনে হাতে হাত মিলিয়ে লুঠের টাকা বিদেশে রাখছে। এখন টাকা লুঠের জন্যই রাজনীতিতে আসা। সারা দেশ এখন পার্টিটাকে ঘেন্নার চোখে দেখে, শুধু আমরাই দেখেও দেখিনা— ভান করে থাকি। আর ম্যাডামের জুতো মাথায় নিয়ে পুজো করি। আজ যাকে বাধ্য হয়ে রেজিগনেশন দিতে বলা হয়েছে, তারও মুখ খোলার মুখ নেই। আমরা চোর, তো লোকে চোর বলবে না? সাঁটগাঁট না ধরলে হাজার হাজার কোটি টাকা চুরি করা যায়, বল? আর সাঁটগাঁটে যে মাননীয়রা সকলেই যুক্ত সে কথা এখন মুর্খও জানে। কেউ মুখ খুলতে পারবে না, কারণ মুখ খুললেই টপ্ লিডাররা টপাটপ ন্যাংটো হয়ে পড়বে। কোনওরকমে তো কোয়ালিশন পার্টনারদের পায়ে তেল দিয়ে টিঁকে আছি আমরা! ১৪ সালের আগে সরকার ফেলে দিলে যুবরাজ আর রাজা হতে পারবে না। পার্টিবিরোধী কথা আগেও বলেছি, আজও বলছি। মিডটার্ম পোল হলে তোমরা কি করবে ভাবো। আমি তো আর ইলেকশনে দাঁড়াবো না। তবে যে ক'দিন আছি, তোমাদের চোখ খুলে দেবার চেষ্টা করব। কেন্দ্রে বাঙালীরা চিরকাল দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও বঞ্চিত হয়েছে। বাঙালী এখনও দেশটাকে ভালবাসে, সত্যিকারের সেকুলারিজম বাঙালীর মধ্যেই বেঁচে আছে। মসজিদের

ইমামদের পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে সেকুলার হতে হয় না বাঙালীকে। এই টাকা সিঙ্গুরে জমিহারাদের বিতরণ করলে ভাল করত। হিন্দু পুরুতদেরও তাহলে দিক। স্বজনপোষণ করার দিকে বাঙালীর বেশি ঝোঁক নেই জানি, তবে ইদানীংকালে মুসলমানপূজন নীতিতে আমাদের কংগ্রেস পার্টিকেও হার মানতে হচ্ছে বামপন্থী আর পরিবর্তিত রাজ্য সরকারের কাছে। এর ফল যে ভবিষ্যতে কতটা বিষময় হবে সেটা ওরা জানে না মনে করো না। আমরা যেমন জেনেও বোবা-কালা হয়ে থেকেছি সেকুলারিজমের নাম করে ওরাও তাই করছে। আমরাই ৬৫ বছর ধরে অন্যদের শিখিয়েছি মুসলমানদের তোষণ কর। আরে, যা না! গিয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দে না— 'হিন্দু ব্রাহ্মণ-কায়স্থ/সুন্দরী/শিক্ষিতা কন্যার জন্য মুসলমান পাত্র চাই। বেশ ঘটাপটা করে নিজেদের মেয়ের বিয়ে দে মুসলমানের সঙ্গে! তবেই প্রমাণ হবে তোরা কে কত সেকুলার! দেখো বাপু, আমি পার্টি মেম্বার বলে নিজেদের মধ্যেও অত রেখেঢেকে কথা বলব না। নরেন্দ্র মোদী ঢাক ঢোল পিটিয়ে কোনওদিন বলেছে— আমি সেকুলার? বলে না। একে বলে বাঘের বাচ্চা, বুঝলে? ও যা, ও সেটা বলার হিম্মৎ রাখে। আমি ওকে ভীষণ পছন্দ করি। আমাদের মতো স্যুয়োডো সেকুলার হয়ে কাজ নেই।'

— 'না, না! সমীন্দ্র এবার হবে। প্রাক্তনকে যে শেষ অব্দি সরাবার সিদ্ধান্তটা বজায় রাখা হলো সেটাই কি কম কথা? উনি তো এঁড়ে বসেছিলেন ইস্তফা দেবেন না বলে! নিজের মন্ত্রকের কাজ কোথায় করলেন উনি? ইনসারজেন্সী বাড়ালেন বই কমাতে পারলেন না ঘোটালাবাজী করতে করতে। আর সেকুলারিজমের তাস তো স্বাধীনতার আগে থেকেই খেলা হচ্ছিল। তা না হলে কি নেহরু পরিবার এদেশের রাজপরিবার হতে পারত, বলুন?'

— 'আরে, আগে হাইকমান্ড থেকে ফরমাল কল আসুক। আপনারা ধরেই নিচ্ছেন যে..?'

— 'আসবে সমীন্দ্র। আজকে আসতেই হবে যে। রাতেই তো মিটিং ১০ জনপথে। — সুমঙ্গলদা বললেন। — 'আপনিও রেল নিয়ে ভাববেন না মালাদি। ওটা নামকেওয়াস্তে অন্য একজনকে দেওয়া হলেও রেলের ইঞ্জিন আমাদের মুখ্যমন্ত্রীই চালাবেন। ওঁর ওপর আমার কিন্তু আস্থা আছে। এখন অনেকটাই পরিণত হয়েছেন তো! তবে ইমামদের ব্যাপারটা আবার অপরিণততার লক্ষণ। এটা ঠিক।'

সমীন্দ্রনাথ নিজের ভেতরের উথাল-পাতাল উত্তেজনা দমন করে চুপচাপ বসে শোনেন সহকর্মীদের কথা।

আজও সমুকে বলা গেল না। মেডিকেল রিপোর্টগুলো ব্যাগের ভেতরেই পড়ে রয়েছে। তিনদিন হলো এসেছেন। অনেক আশা নিয়ে নিয়ে এসেছিলেন যে সমু অন্য সব ফেলেও দিদিভাইয়ের কি এমন প্রয়োজন পড়ল সেটা আগে শুনবে, কিন্তু ও তো ঝাড়খণ্ডের মাওবাদীদের খবর আদায়ের জন্য বেশি উৎসাহী! ও তো মন্ত্রী-টন্ত্রী নয় এবার! পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত একজন এম পি মাত্র। নক্সাল-মাওদের নিয়ে ওর এত আগ্রহের কারণ খুঁজে পান না নিভা। আজ রাত্রে কাগজগুলো নিয়েই খাবার টেবিলে আসবেন। আর দেরি করা চলবে না। ওষুধপত্র খাচ্ছেন বলে শ্বাসকষ্টটা এখন আর হচ্ছে না হয়ত, কিন্তু হবে না এমন কথাও বলা যায় না। চিত্রার কাছে বলে ওর মাধ্যমে নিজের ভাইয়ের কানে কথাটা তুলতে আত্মসম্মানে বাধে। সমু যে খুবই ব্যস্ত সে তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। তবে ওর ভেতরে একটা অন্য ধরনের উত্তেজনাও লক্ষ্য করেছেন। চাপা অস্থিরতা দিদিভাইয়ের নজর এড়াতে পারেনি। ও কি আবার দলবদল করবে নাকি? কংগ্রেসের যা ভয়ানক দৈন্যদশা সমু ছেড়েও দিতে পারে। বলা যায় না কিছুই। সল্টলেকের এই বাড়ি যত সুন্দরই হোক নিভার এখানে ভাল লাগছে না। একমাত্র মামার কাছে বসে থাকলে নিভা যেন দমদমের বাড়ি, বাবা-মা, মামীমা সবাইকে ফিরে পান। আজ সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে সমুকে একলা পেয়ে বলেছিলেন উনি — 'ভাই তুই আমার কথাটা তো কানে নিতেই চাইছিস না রে! আমার যে বড়ো তাড়া আছে, সেটা বুঝতে চাইছিস না। এখন শোন্ না কেন এসেছি।'

সমীন্দ্র উত্তরে দিদির হাতের ওপর হাত রেখে বললেন— 'দিদিভাই তোর ব্যাপারটা যে জরুরি সেটা আমি জানি। জরুরি কারণ না থাকলে তোর মতো আত্মসম্মানী মানুষ সহজে নিজের ডেরা ছেড়ে ছুটে আসত না। আমাকে কয়েকটা দিন সময় দে। তোর প্রবলেম মন দিয়ে শোনার মতো শান্ত হতে দে আমার মনটাকে। তারপর সব সলভ্ করে দেব। ভাবিস না। জানিস, আমি একটা পারসোনাল ব্যাপারে ভয়ানক দোলাচলে আছি। এখন বলতে পারব না সে কথা। তাছাড়া তোর এত তাড়া কিসের রে? খাবি-দাবি গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াবি আর শরীরটা ভাল করবি। এখন এখান থেকে নড়ার নামও নিবি না।'

— 'বেশ। তবে বেশিদিন লট্‌কে রাখিস না। তাহলে দিদিভাইকে আর পাবি না।'

— 'এ্যাই! বাজে কথা বলবি না। কাল কোথায় কোথায় ঘুরলি? শুনলাম চিত্রার গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছিলি? চিত্রাই

With Best Compliments From :-

South Calcutta Diesels Pvt. Ltd

Sales & Service

225-D, A. J. C. Bose Road
Kolkata - 700 020
Phone : 033-2302-5100-103
Fax : 033- 2287-6329
E-mail : peivik@vsnl.net / scdtodi@scdtodi.com

Authorised Dealers of

- **M/s. Motor Industries co. Ltd.**
- **M/s. Bosch, GMBH-Germany**
- **M/s. Deutz, A. G., Germany**
- **M/s. Lombardini - Italy**
- **M/s. V. M. Motori - Italy**

Saraogi

Saraogi Udyog Private Limited

Importer, Merchants & Handling Agents for Coal and Coke

21, Hemant Basu Sarani "Centre Point" Suit No. 212
2nd Floor, Kolkata - 700 001
Fax : +91-33-22435334, +91-33-22138782
Phone : +91-33-22481333 / 0674, +91-33-2213 8779/80/81
Email : saraogiudyog@eth.net; saraogi@cal2.vsnl.net.in
www.saraogiudyog.com

বললো।'

— 'হ্যাঁ রে! মঞ্জুরীর বাড়িতে গিয়েছিলাম বিকেলে। কাল দুপুরে আবার যাবো। খেতে বলেছে দুপুরে। শুভ্রদাও এসেছিল কাল। অনেককাল বাদে দেখা হবে, খুব ভাল লাগল।'

— 'আর না গেলেই ভাল হতো। শুভ্রদারাই এখন মাওবাদী হার্মাদ রে! ওরা দেশের শত্রু।'

অনেকদিন পর প্রিয় বন্ধু মঞ্জুরীর সঙ্গে একটা পুরো দিন কাটিয়ে মন ফুরফুরে হয়ে গিয়েছিল নিভার। চিত্রা, তাঁকে ওর পারসোনাল ছোট গাড়িটাতে করে পাঠিয়েছিল। আসার সময় মনেও ছিল না তাই লক্ষ্যও করেননি। এখন যাবার সময় গাড়িতে উঠতে গিয়ে সেই ছেলেদুটোকে লক্ষ্য করলেন। মঞ্জুরীদের রাস্তার মোটরসাইকেলের সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঙ্গা থেকে কিছু খাচ্ছে, দু'জনের কিন্তু চোখ এদিকেই। একজনকে চিনতেও পারলেন। গংগু মুরমু। মাথার হেলমেট বাইকে ঝোলানো বলেই মুখখানা দেখা গেল। মনে মনে হেসে না দেখার ভান করে নিভা গাড়িতে উঠলেন। ওরাও যথানিয়মে গাড়ি ফলো করতে শুরু করল। সেই প্রশ্নটা আবার মনে উঁকি দেয়— 'কেন? কাদের ভয়?' তাঁর এই জরাজীর্ণ প্রাণটার কার কাছে এত মূল্য যে কলকাতা শহরে ওরা তাঁকে রক্ষার কাজে ব্যস্ত হয়েছে?'— উত্তর খুঁজে পান নিভা তাই পুরো ব্যাপারটাকে বেশি বাড়াবাড়ি, সিনেমাটিক ড্রামা— এসব ভেবে বিরক্ত হয়ে ঝেড়ে ফেলে দেন মন থেকে।

বাড়ির সামনে এসে যা দেখলেন তাতে সচকিত হয়ে উঠলেন। এত গাড়ি, এত লোকের ভীড় কেন? খারাপ কিছু? না, তা মনে হচ্ছে না। সব হাসি-হাসি মুখ এবং মুখগুলো সবক'টাই সচল অর্থাৎ সকলেই কথা বলায় ব্যস্ত। মোটরসাইকেলটা দূরত্ব কমিয়ে নিমেষে তিনি যেদিকে বসেছেন সেদিকে একেবার তাঁর গা ঘেঁষে গাড়ির পাশে পাশে চলতে লাগল গেটের সামনে অবধি। গাড়ি গেট পেরিয়ে ঢুকতেই ওটা দ্রুত বেরিয়ে গেল সল্টলেকের রাস্তা দিয়ে। সমুর অফিসঘরেও অনেক লোক, কারও কারও হাতে ফুলের মালা, স্তবক। ব্যাপারটা কি? নিভা ডানপাশ দিয়ে অন্দরমহলে যাবার সিঁড়ি ধরে উঠে এসে দেখেন সেখানেও মহিলাদের ভীড়। তারই মাঝে চিত্রা উজ্জ্বল মুখে অভিনন্দন গ্রহণ করছে। সমুকে এখানে দেখতে পেলেন না। চিত্রাই তাঁকে দেখে খুশিতে উদ্ভাসিত মুখে এগিয়ে এলো।

— 'দিদিভাই, তুমি এসে গেছ? তোমার বন্ধুর বাড়িতে বসে কোনও খবর শুনেছ? তোমার ভাই যে আবার মন্ত্রী হতে যাচ্ছেন দিদিভাই। পার্টির লোকেরা অভিনন্দন জানাতে এসেছেন। সবাইকে মিষ্টি মুখ করানো হচ্ছে। হাইকমান্ড থেকে ফোন এসেছে মন্ত্রিসভায় ফেরবদল হবে, তাই আজ রাত্রে জরুরি মিটিং আছে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। তোমার ভাই একটু পরেই দিল্লী চলে যাবে দিদিভাই। তুমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছ।'— আনন্দের আতিশয্যে চিত্রা একনাগাড়ে বলে গেল।

হতচকিত নিভা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারলেন না চিত্রার মতো। শুধু বললেন— 'এ তো খুব ভাল খবর। তোমরা আগে জানতে না?' — নিভার মনে পড়ে গিয়েছিল কলকাতা আসার আগে সার্থীর কথা। ও বলেছিল— 'এবারও মন্ত্রী হবে শুনেছি।'— সার্থীরা কি করে আগে থেকেই এসব খবর জানতে পারে? ওদের নেটওয়ার্ক?

চিত্রা বলল— 'তোমার ভাই জানত কিনা জানি না। সে বড্ড পেট চাপা মানুষ। আমি তো কিছুক্ষণ আগে শুনলাম যে দিল্লী থেকে জরুরি তলব এসেছে। হোম মিনিস্টার রিজাইন করেছেন, প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভায় কিছু পরিবর্তন করবেন, কয়েকজন এম পি নাকি মন্ত্রী হবেন, তার মধ্যে তোমার ভাইও একজন।'

সেই সন্ধ্যায় সমু চলে যাবার আগে বলল— 'এই খবরটার জন্যই দোলাচলে দুলছিলাম রে দিদিভাই। ভগবানকে ডাক তোর ভাই যেন সম্মানিত হতে পারে হোম মিনিস্ট্রি হাতে পেয়ে। ফিরে এসেই তোর ব্যবস্থা করব। জানিস, বাবাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম, বাবা প্রণাম নিল না। বাবা যে কেন আমার সঙ্গে এরকম করে বুঝি না। তুই তো দেখছিস, বল বাবার প্রতি কর্তব্যে আমার কি ত্রুটি আছে? আমার ক্ষমতা অনুযায়ী যতরকম সম্ভব সবই তো করছি, তবুও বাবার মন পেলাম না।'

নিভা ভাইয়ের পিঠে হাত রেখে বলেন— 'কষ্ট পাস না। মামার নব্বইয়ের উপর বয়স হয়েছে রে। এই বয়সে মানুষ বাচ্চাদের মতো বিহেভ করে। যা, হোম মিনিস্টার হয়ে মামার নাম রৌশন কর।'

— 'তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। একটা কথা, তুই মঞ্জুরীদির বাড়িতে আর যাস না। শুভ্রদার ইনটেলিজেন্স রিপোর্ট ভাল না। '৭০ সালে পুলিশ পায়ে গুলি করেও ওকে ধরতে পারেনি। এরপর কোথায় যে লুকোল জানা যায়নি। প্রকাশ্যে এসেছে একথা তোর মুখেই শুনলাম চল্লিশ বছর পর। .. তুই সাত্যকিকে মনে করতে পারলি না, এটা কিন্তু মেনে নিতে পারলাম না। ও তোর ছাত্র ছিল। ওদের থেকে দূরে থাক তুই। ওরা এখন দেশের শত্রু।'

কাল সমু মন্ত্রী হতে দিল্লী চলে যাবার পর রাত্রে নিভা তিনতলায় মামার ঘরে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন মামাকে বোঝাবেন ছেলের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার যেন না করে মামা।

কিন্তু বোঝানো হয়নি, কারণ মামা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদে পেতে রাখা চেয়ারে বসেছিলেন অনেকক্ষণ। চিত্রা বলেছিল, সল্টলেকে বাড়ি করার নাকি নানা নিয়মকানুন। বসতবাড়ি তিনতলা করার অনুমতি নেই। তবে যাদের ইনফ্লুয়েন্স আছে তারা সবই করে। — 'তোমার ভাই সেজন্য ইনফ্লুয়েন্স থাকা সত্ত্বেও পুরো ছাদে ঘর করেনি। ও সিঁড়ির ওপরে বড়ো বড়ো দু'খানা রুম বানিয়েছে বাবার জন্য। দুটো রুমেই গরম না লাগার জন্য ডাবল ছাদের ঢালাই। দুটো ঢালাইয়ের মাঝে ৬ ইঞ্চি গ্যাপ। এ সি আছে। কিন্তু এত হাওয়া গেলে যে বাবা এ সি চালাতে বারণ করেন। ওনার নাকি ঠাণ্ডা লাগে।'

ছাদে ঘসের লন, লনের চারপাশে ঘিরে বাগান। ঈশান কোণে ছোট ছোট কচি বাঁশ গাছের ঝাড়। রেলিং বেয়ে উঠেছে লতানো ফুল।— 'সত্যি! কি চমৎকার ছাদখানা। এখানে বসে থাকলেও তো পারে মামা। সমু তো মামার সুখে থাকার কোনও ত্রুটি রাখেনি। দুটো লোক আছে সারাক্ষণ দেখাশোনা করার জন্য। তবুও মামা অখুশি কেন? চিত্রা নিজেও শ্বশুরকে যত্ন-আত্তি করে, ভালবাসে। কে জানে সমুর কোনও ব্যবহারে মামা মনে আঘাত পেয়েছিল কিনা? আমি তো কতকাল পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। কিছুই জানি না। দমদমের বাড়িতে থাকতে মামা এরকম ছিল না। আর কর্তব্য সচেতন সমু সুযোগ দিতই না কাউকে কিছু বলার। এখন তাহলে কি এমন হলো যে মন্ত্রী হতে যাওয়া ছেলের প্রণাম প্রত্যাখ্যান করে তাকে কষ্ট দিল মামা? — কাল আমাকে মামার সঙ্গে কথা বলতেই হবে।'

— 'কি ভাবছ মামা?'

— 'নিভা? আয় মা আমার পাশে বোস। তোর সঙ্গে যে অনেক কথা বলার আছে আমার। ভালই হয়েছে আজ হারামজাদাটা নেই। অনেকক্ষণ কথা বলব।'

— একি মামা! তুমি ভাইকে ওরকম ভাষায় কথা বল কেন? ও কি দোষ করেছে যে কাল ওর প্রণামটাও নিলে না? আমার কিন্তু এটা ভাল ঠেকেনি!'

— 'ভাই! তুই জানিস না নিভা ও কারও ভাই নয়, কারও ছেলে নয়, ও কখনও কার— কিছু হতেই পারে না। জানিস, প্রতিক্ষণ আমি নিজের মৃত্যু কামনা করি। বেঁচে থাকার জন্য লজ্জা হয়, দুঃখ পাই। নিখিলের মৃত্যুর পর তুই যেমন মরেও বেঁচে আছিস জঙ্গলে গিয়ে, আমারও তেমনই মানসিক মৃত্যু হয়ে গেছে। বুকের ভেতর প্রাণের স্পন্দন নেই, তবু নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী বেঁচে আছে। এই কষ্টটা শুধু তুই বুঝবি। দরজাটা বন্ধ করে দে তো। আর ওই এ্যাটেনডেন্ট রণজিৎ ছেলেটাকে বলে দে, এবেলাটা আমি ওকে ছুটি দিলাম। যা।'

নিভা মামার আজ্ঞা পালন করে এসে বসলেন। মামা নিভার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন— 'সারাটা জীবন ঐ চাঁদডুংরীর মতো বন্য একটা জায়গায় কাটিয়ে দিলি, তার জন্য আমার দুঃখ হয় না রে। বরং মনে হয় তুই ওখানে গিয়ে শান্তি পেয়েছিস। বন্যরা শহুরেদের থেকে হাজারগুণ ভাল হয়। তুই ওদের মাঝে নিজের জায়গা করে নিতে পেরেছিস বলে ওরাও তোকে ভালবেসে আপন করেছে। ওরা বন্য বলেই ওদের একটাই চেহারা। মুখোশ নেই। দুটো চেহারা সভ্য সমাজের মানুষের থাকে। জন্তু জানোয়ারদেরও একটাই চেহারা। মাংসাশীরা ক্ষিদে পেলে আক্রমণ করে শিকার করবে, খাবে, তারপর শুয়ে পড়বে। তখন কেউ ওর পাশ দিয়ে চলে গেলেও আর আক্রমণ করবে না। যারা মাংসাশী নয়, তারা তো এতই নিরীহ যে আঘাত না করলে শিং উঁচিয়ে তেড়েও আসবে না। মানুষই কেবল মুখ আর মুখোশ পরা জন্তু, যারা নিজের স্বার্থের জন্য হিংস্র হয়ে ওঠে। ক্ষিদে না পেলেও হত্যা করে। আপন-পর কোনও সম্পর্কের অর্থ নেই এদের কাছে।'

— 'ওই দ্যাখো! তুমি হঠাৎ করে দার্শনিক হয়ে উঠলে! এসবের সঙ্গে ভাইয়ের কি সম্পর্ক? ও তো আমাদের সকলের জন্য ভাবে মামা। নিজের দায়দায়িত্ব পালনে অবহেলা তো করেনি কোনওদিন? তাহলে তুমি ওকে কেন দেখতে পার না?'

বিচিত্র এক হাসি ফুটে উঠে নৃপেন্দ্রের দন্তহীন মুখে— 'ওই যে বললাম মুখ-মুখোশ! তোরা সবাই ওর নিঁখুত মুখোশটা দেখিস। শুধু আমিই একদিন তোর ভাইয়ের আসল মুখটা দেখে ফেলেছিলাম। আমি এক অভিশপ্ত বাপ যে ওই ছেলেকে জন্ম দিয়েছে। আমার এত পাপ যে আত্মহত্যা করে মরতে চেয়েও মরতে পারলাম না।'

চমকে উঠে নিভা প্রশ্ন করেন— 'মানে? তু-তুমি সুইসাইড করার চেষ্টা করেছিলেন আর আমি কিচ্ছু জানতে পারলাম না? এমন পাগলামী কেন করতে গেলে মামা?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নৃপেন্দ্রনাথ বলেন— 'তুই আমাকে নব্বইয়ের পাগল ভাবছিস? পাগল নই রে মা! পাগল হয়ে গেলে তো বেঁচে যেতাম। পাপ, অনুতাপ কিছু মনে থাকত না। তুই কি করে তখনকার কথা জানবি? পুলিশের টর্চারে নিখিলের মৃত্যু, তোর পেটের ভেতরের সন্তানের মৃত্যু, যমের সঙ্গে তোর লড়াই, এখানকার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে একা একা ছোটনাগপুরে চলে যাওয়া— সবই তো একসঙ্গে হলো।'

— 'সে সময়ে কিন্তু ভাই-ই সমস্তটা সামলিয়ে ছিল। নিখিলকে, আমাদের সন্তানকে ও বাঁচাতে পারেনি, কারণ সেটা ওর হাতে ছিল না। কিন্তু ওর দিদিকে বেইলে ছাড়ানো, যমের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচিয়ে তোলা, সব ও-ই করেছিল মামা।'

নৃপেন্দ্র উত্তেজিত হয়ে ওঠেন— 'নিভা! সেটাই তো ওর নিখুঁত মুখোশ! আচ্ছা, আমার একটা কথার জবাব দে— সমু যে তোদের জন্য চাঁন্দডুংরীতে চাকরির ব্যবস্থা করে তোদের দু'জনকে ওখানে পাঠাচ্ছিল সে কথা আমরা ক'জন ছাড়া আর কেউ জানত কি? সমু নিজে দাড়ি, গোঁফ, পোষাক কিনে এনে দোতলার ঘরে দরজা বন্ধ করে মেক-আপ করেছিল। তোরা যে দমদমের বাড়িতে আছিস ১২ দিন ধরে সে খবরও কাকপক্ষী জানত না। রাঁচি এক্সপ্রেস ধরবি বলে সন্ধ্যের পর অন্ধকারে অত্যন্ত গোপনে তোরা বের হলি মুসলমান মিঞা-বিবি সেজে, তুই বোরখা পরে। আমরাই চিনতে না পেরে তাজ্জব, তো অন্য লোকে ভিড়ে ভরা হাওড়া স্টেশনে চিনবে কেমন করে রে?'

চমকে ওঠেন নিভা। ঠিক এই প্রশ্নগুলো শুভ্রদা করেছিল। শুভ্রদা, মামা এরা কি ইঙ্গিত করতে চায়? নিভার শরীরটা যেন কেমন করছে। সেদিনের কথা সব মনে আসছে ছবির মতো। মামা নিভার শুকিয়ে যাওয়া মুখ লক্ষ্য করলেন না। বলতে লাগলেন— 'সমু যখন আমাদের পার্টি ছেড়ে বিরোধী পার্টিতে যোগ দিল, তখন থেকেই নজর রাখছিলাম। বুঝতে পারছি না ও কি চায়। তখন ওর বয়স কম, বুঝেসুঝে এসব করছে বলে মনে হতো না। তোর বাবার চেয়ে পার্টিতে আমার জানাশোনা একটু বেশি ছিল। এমনকি বিরোধী দলেও কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল আমার। তাদেরই একজনের মুখে শুনেছিলাম, সমু উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ও আদর্শের জন্য রাজনীতি করে না, এটাকে প্রচুর অর্থ উপার্জনের মাধ্যম মনে করে পেশা হিসেবে নিয়েছিল। শুনে বড়ো আঘাত পেয়েছি তখন। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য ও যে নিখিল আর তোকে ব্যবহার করবে কল্পনাও করতে পারিনি। কুলাঙ্গার সন্তান। নিভা! নিভা রে! মা আমার! তোর সব সর্বনাশের জন্য দায়ী ওই কুলাঙ্গার। ইলেকশনের টিকিট খরচপত্র সব কবুল করিয়ে নিয়ে ও নিজে তোদের ধরিয়ে দিয়েছিল। ও খুনী। নিখিলকে তোর সন্তানকে সমু মারিয়েছে। নিখিল প্রাইজ ক্যাচ ছিল। আমার বাবা-মা'র মতো দিদি-জামাইবাবু শোকে তাপে কেঁদেকুটে অকালে মরে গেল। সব সর্বনাশের নায়ক ওই হারামজাদা, যাকে তুই এখনও ভাই-ভাই বলে বিশ্বাস করছিস। নিভা! কি হলো? শুয়ে পড়লি কেন? শরীর খারাপ হলো এসব সত্য জেনে ফেলে? দাঁড়া জল দিই চোখে মুখে।'

নিভার হার্ট অ্যাটাক হয়নি। অজ্ঞানও হয়নি। আশ্চর্যই বটে! এতকালের বিশ্বাস, ভালবাসাকে কেউ যখন ছুরি দিয়ে কেটে ফালা ফালা করে দেয়, তখন যেমন চোখের সামনে দেখেও অবিশ্বাসে পাথর হয়ে যায় মানুষ, নিভাও তেমনি শোকে-দুঃখে, বিশ্বাস-অবিশ্বাস— সমস্ত অনুভূতি শূন্য হয়ে ক্ষণিকের জন্য স্থবির পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। মামা বিছানার পাশে রাখা জগ থেকে মুখে একটু জলের ছিঁটে দিতেই নিভা

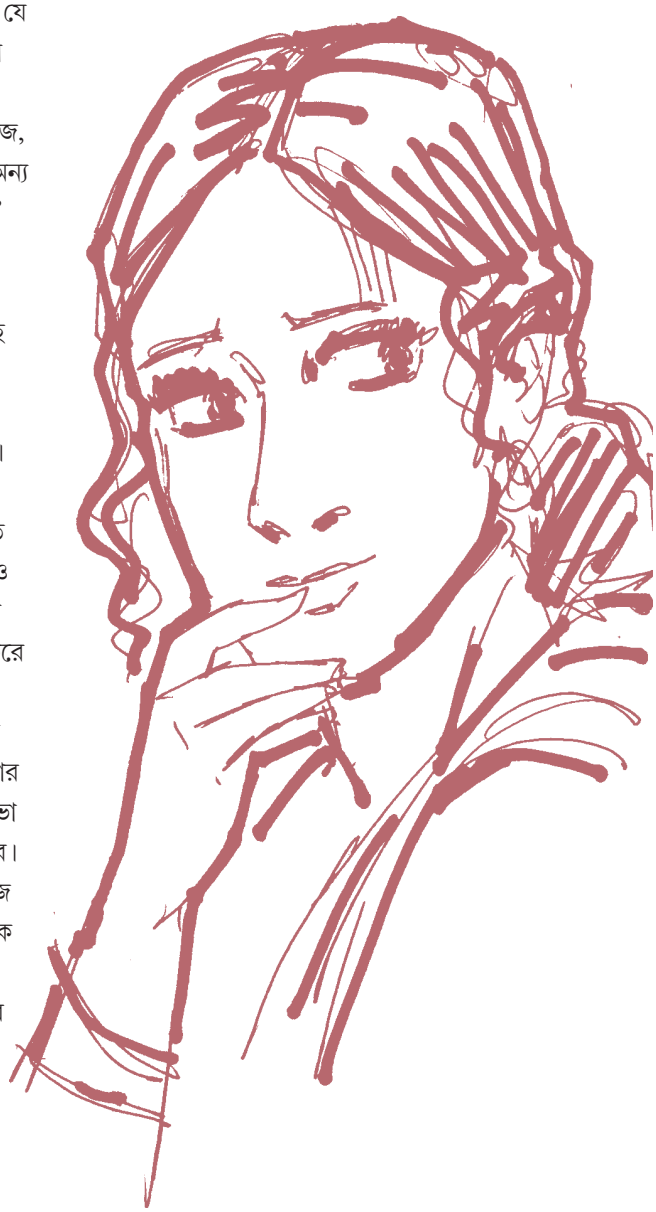

বললেন— 'আমি ঠিক আছি মামা! আমার কচ্ছপের মতো প্রাণ। সহজে মরব না।'

— 'মরবি কেন? প্রতিশোধ নিতে পারবি না? আমি তো বেঁচে রয়েছি শুধু সত্য কাহিনী তোকে জানাব বলে। ও তোর আদরের ছোট ভাই নয় ও তোর একমাত্র শত্রু। প্রতিশোধ নে।'

— 'তুমি তো জানো মামা, আমার একটাই স্পৃহা ছিল, নিখিলের সঙ্গে জীবনটা কাটানো। ও চলে যাবার পর আর কোনও স্পৃহা আমার জাগেনি, প্রতিশোধ তো দূরের কথা। এখন গিয়ে গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লে রাঁচি এক্সপ্রেস পাবো।'— উঠে পড়েন নিভা।

— 'চলে যাবি? যা, তাই যা মা। বিশ্বাসঘাতকের বাড়িতে থাকার অসম্মান যে কি সে তো আমি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছি। তুই তোর আপনজনদের ভালবাসার কাছে ফিরে যা। আর এ জীবনে দেখা হবে না, এটাই শেষ দেখা। সাবধানে যাস। ভাল নেই তুই জানি আমি। তবু বলি ভাল থাকার চেষ্টা করিস। আমি মরে গেলে তোর আর আত্মীয় বলে কেউ থাকবে না মা। ওখানে ওরাই তোর আত্মীয়।'

নিভা মামাকে প্রণাম করে বললেন— 'আশীর্বাদ কর আমি যেন তাড়াতাড়ি মরি।'

চিত্রার অনুনয় উপেক্ষা করে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি ধরলেন নিভা। সেকেন্ডক্লাস স্লিপারের টিকিটের লাইনে অবসন্ন শরীর নিয়ে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল। ঠিক তখনই গংগু পাশে এলো ভুঁইফোড়ের মতো। — 'তুমি গিয়ে ওইখানে বসো। আমরা অনেকেই আজ এখানে আছি। সাত্তুও এখানে মা। অন্য কোথাও যেও না কিন্তু।'

নিভা যেন আপনজন ফিরে পেলেন। মাথা হেলিয়ে বাধ্য মেয়ের মতো গিয়ে বসে পড়লেন।

— 'গাংগুরা এখনও আমার সঙ্গে আছে, নজরে রেখেছে সব। তাহলে কি সমুর কাছ থেকেই আমার বিপদের আশঙ্কা ছিল ওদের মনে? এসব ব্যবস্থা সাত্যকি করিয়েছে বুঝতে পারছি। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মাওবাদীদের চীফ এখন সাত্তু। সমু বারবার সাত্যকির ইনফরমেশন চেয়েছে আমার কাছে। আমি যে কিছু দেব না সেটা বুঝতেও পেরেছে ও। আমি কি তবে না জেনেই বাঘের খাঁচায় গিয়ে ঢুকে পড়েছিলাম? আজ কি আবার হাওড়া স্টেশনে কিছু ঘটতে চলেছে? ওরা অনেকে এমনকি সাত্যকিও এখানে কেন?'

'মা'!— নিভার ভাবনায় ছেদ টেনে পাশ থেকে মা বলে কেউ ডাকে। ফিরে তাকিয়ে যাকে দেখেন, তার চোখ, হাসি মুখের ঝক্‌ঝকে দাঁতের সারি চিনে নিতে নিভার সময় লাগে না। —'তুই সামান্য একটু বেশ পাল্টে এরকম ওপেন জায়গায় কি করতে এসেছিস পাজি ছেলে?'

— 'তোমাকে ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে যেতে। জানতাম তো যেখানে গিয়েছিলে সেখানে এখন কত ব্যস্ততা। ১৫-২০ দিন বসে থাকলেও হতো কিনা সন্দেহ। ব্যাঙ্গালোরে তো ব্যবস্থা করাই ছিল, তোমার আবদার রাখতে কলকাতায় পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। তোমার মামার সঙ্গে যাতে শেষ দেখাটা হয়— এই আর কি?' — হাসে সাত্যকি।

বিস্মিত নিভা কথা খুঁজে পান না কতক্ষণ। — 'তুই কি করে মামার কথা জানলি? মামার সঙ্গে শেষ দেখা কেন বলছিস? মামা তো ভালই আছে। তুই আমাকে খুলে বলবি এসব কি চলছে? আমাকে অন্ধকারে রেখে আমাকে নিয়েই লুকোচুরি খেলছিস কেন? মা কি তাহলে তোদের শত্রু হয়ে গেল?'

— 'ছিঃ! তুমি যেদিন আমার শত্রু হবে সেদিন আমার মৃত্যু হবে। তোমাকে সব বলতেই হবে এবং আজই। তাই তো এমন ওপেন জায়গায় হাজারও চোখের সামনে যাত্রী সেজে বসেছি। যাবো তো ফ্লাইটে। তার এখন অনেক দেরি।'

— 'ফ্লাইটে! কোথায়?'

— 'কেন? বললাম না ব্যাঙ্গালোরে যাবো! চিত্রাদি ফোন করে শুভ্রদাকে বলল তুমি রাঁচি যাবে বলে ট্যাক্সি ধরেছ, ওমনি শুভ্রদা আমাকে জানিয়ে দিল। আমরা এখানে এলাম।'

নিভার আজ বারবার হতভম্ব হবারই পালা। এবার অবশ্য রেগে যান সাত্তুর ওপরে— 'মার সঙ্গে মস্করা করছিস? চিত্রা, শুভ্রদা এদের তুই কি করে চিনবি রে? চিত্রা সমুর বৌ! ও শুভ্রদাকে চেনে না। এসব আজেবাজে কথার মানে?'

— 'মানে আছে মা, মানে দীর্ঘকাল ধরে ছিল। তোমার সঙ্গে মস্করা করার স্পর্ধা আমার যেন কোনও দিন না হয় মা। শোনো, আমি সংক্ষেপে বলব সময়াভাবে। তুমি সব শুনবে, প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করো না প্লীজ! আমাদের এয়ারপোর্টে দু'ঘন্টা আগে রিপোর্ট করতে হবে।

নিখিল মিশ্রর কাস্টডি ডেথ নিয়ে অনেক হৈচৈ হলেও ৭০-এর দশকে নক্সালবাদীদের নেটওয়ার্ক বলে কিছুই ছিল না। ওদের পায়ের তলার মাটি শক্ত ছিল না। যার জন্য শুধু নিখিল মিশ্র নয়, হাজার কয়েক তরুণের হত্যার ফয়সালা না করতে পেরে যারা তখনও বেঁচে ছিল তারা পালিয়ে গিয়েছিল প্রাণ বাঁচানোর জন্য। এই পালিয়ে যাওয়ারা নিজেদের আইডিওলজিকেও বাঁচিয়ে রেখেছিল এবং ধীরে ধীরে ঘর গোছাচ্ছিল নীরবে। অতবড় আঘাত সামলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঘর গোছাতে অনেক বছর লেগে গেছে। এখন নক্সালরা আর দুর্বল নয়। ওদের পায়ের তলায় শক্ত জমি আছে, অত্যন্ত স্ট্রং নেটওয়ার্কিং আছে। 'সিস্টেমে'র মেরুদণ্ড ভাঙ্গার মতো কোমরের জোর আছে। এদের লড়াই ৭০-এর অসমাপ্ত লড়াইয়েরই কন্টিনিউয়েশন, নৃশংস একপেশে সিস্টেমের স্রষ্টাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়। নক্সাল

আইডিওলজিতে দেশদ্রোহিতার স্থান নেই। মাওবাদী, হার্মাদ, বিদেশের চর— এসব ব্র্যাণ্ডগুলো ক্ষমতাভোগী লোকেদের দেওয়া বদনাম। ঠিক যেভাবে বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক, দেশদ্রোহী বলে ব্র্যাণ্ডেড করা হয়েছে এবং দেশের জনতাকে বিশ্বাস করানো হয়েছে। একইভাবে শুরু থেকেই ক্ষমতাভোগীরা নক্সালবাদের উত্থানে ক্ষমতা হারাবার ভয়ে নানা রকমভাবে ডিফেন্স করার চেষ্টা করে চলেছে একটা সুস্থ আদর্শকে। জঙ্গল সাঁওতাল, কানু সান্যাল, চারু মজুমদারদের পথেই রয়েছি। স্রোত ছেড়ে ছোট ছোট দল বেরিয়ে গিয়ে নানা কুকর্ম করে অপবাদ কুড়োচ্ছে এবং আমাদের মূল স্রোতেও কাদা ঢালছে। কিন্তু আমরা আদর্শচ্যুত হইনি মা। নিখিল মিশ্রর ধরা পড়ার রহস্য উদ্ধার করার প্রথম প্রয়াস শুরু করেছিলেন তোমার মামা নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তোমাদের ধরিয়ে দিয়েছিল তোমার মামাতো ভাই সমীন্দ্র। তোমার ভাই শুধু নিখিল মিশ্র এবং তাঁর সন্তানের হত্যাকারী নয় মা, আরও বহু ছেলের মৃত্যুর কারণ। তোমার মামা এসব জেনে ফেলার পর প্রথমে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে বিফল হন, তারপর নিজের একমাত্র ছেলের অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য ৭০-এর বেঁচে যাওয়া নক্সাল নেতাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তখনই সরোজ দত্ত, অভিমন্যু চ্যাটার্জি, জগন্নাথ পাণ্ডা, শুভ্র সেনগুপ্ত, চারু মজুমদার এদের সঙ্গে মামার ঘনিষ্ঠতা হয়। কিন্তু তখনও সমীন্দ্রকে শাস্তি দেবার মতো শক্তি সংগ্রহ করতে পারেনি হাড়গুঁড়িয়ে দেওয়া নক্সালরা। সমীন্দ্র তখন এম এল এ হয়েছে, বয়স মাত্র সাতাশ শুরু। সমীন্দ্রর জীবনে কোনও প্রেম আসেনি। ওর একমাত্র প্রেম ক্ষমতার সঙ্গে। নৃপেন্দ্র নিজে পছন্দ করে নিজের পার্টি ইউনিয়ন বন্ধুর এম এ পাশ মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলেন। পুত্রবধূকে একটু একটু করে স্নেহ মমতার বাঁধনে বাঁধতে লাগলেন শ্বশুর। এইভাবেই যখন শ্বশুর-পুত্রবধূর মধ্যে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক দৃঢ় হলো তখন নৃপেন্দ্র ছেলের অপরাধের লাটাইয়ের সুতো সাবধানে একটু একটু করে খুলতে লাগলেন বৌমার কাছে। ততদিনে সমীন্দ্র দুই ছেলের বাবা হয়েছে এবং স্ত্রী চিত্রার চোখেও ওর প্রবল স্বার্থপর চেহারাটা ধরা পড়েছে। স্বামীর সম্বন্ধে কিছু খবর জোগাড়ের জন্য চিত্রা নিজেই তখন আগ্রহী হয়ে পড়েন। শ্বশুরমশাই এই মূল্যবান সময়টার জন্যই অপেক্ষা করেছিলেন। চিত্রাদি তোমাকে আগে দেখেনি মা, কিন্তু স্বামী এবং শ্বশুরের কাছে গল্প শুনেছে। সমীন্দ্রর মতো ধূর্ত লোক স্ত্রীর কাছে তাদের দুই ভাইবোনের মধুর সম্পর্কের কথা, জামাইবাবু নিখিল মিশ্রর করুণ পরিণতির বেদনা, দিদিভাইয়ের ওপর পুলিশী নির্যাতন, সন্তানহানি — এসব নিঁখুত বর্ণনা করেছে। শুধু এসবের পেছনে যে ওরই কালো হাতখানা ছিল সে কথাটা গোপন রেখে। নৃপেন্দ্র সঠিক সময় উপস্থিত হওয়া মাত্র বৌমাকে সব কথা খুলে বলে সমীন্দ্রর আসল চেহারা প্রকাশ করে দেন। তিনিই শুভ্র সেনগুপ্ত, সুশীতলদা, সরোজ দত্ত এদের সঙ্গে চিত্রাদির পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সব সত্য তথ্য জানার পর চিত্রাদি নিজেই ভয়ানক ভাবে মুষড়ে পড়েছিল। সামলে ওঠার পরে নিজে থেকেই সমীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটা মুভমেন্টের খবর আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে লাগল একেবারে বিদেশী স্পাই থ্রিলারের আন্ডার কভার এজেন্টের মতো। ওর কাছ থেকেই আমরা জানতে পারলাম হোম মিনিস্টার ইস্তফা দিতে বাধ্য হবেন। সমীন্দ্র নিজে হোম মিনিস্ট্রি পাবার জন্য জোরদার লবিইং করে চলেছেন। ওঁর ৭০ সালের নক্সাল নিধনের রেকর্ড এবং নিজের দিদি-জামাইবাবুকেও ধরিয়ে দেবার কথা বলে কনভিন্স করিয়েছেন সবাইকে। বলেছেন, আগের হোম মিনিস্টার এয়ার স্ট্রাইক করে নক্সালদের জঙ্গল থেকে ফ্লাশ আউট করে খতম করবেন বলে ফাঁকা হুমকি দিয়েছেন। কিন্তু উনি ফাঁকা হুমকি নয়, সত্যিই ইস্টার্ন কোস্টলাইন ধরে বেঙ্গল পর্যন্ত সমস্ত নক্সাল অধ্যুষিত অরণ্যেও এয়ার-স্ট্রাইক করে এই নক্সাল মিনেস (Menace) -কে চিরতরে দূর করবেন। একটি নক্সাল, একটি মাওবাদীও বেঁচে থাকবে না। সমীন্দ্র নক্সালদের আবার উত্থানের জন্য তোমাকে দায়ী করেছেন মা। কেবিনেটকে বলেছেন— তুমি নাকি স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য বিগত চল্লিশ বছর ধরে নতুন করে নক্সালবাদকে জাগিয়ে তুলেছ তোমার ছাত্রদের হাতিয়ার করে। সমীন্দ্রর এখন তুমি হলে প্রথম টারগেট। সে জন্যই আমরা তোমাকে কোলকাতার রাস্তায় সারাক্ষণ নজরে রেখেছিলাম। বাড়িতে চিত্রাদি আছে, তাই ভয় ছিল না। আমাদের নেটওয়ার্ক জানত সমীন্দ্র তোমাকে নজরে রেখেছেন। তোমার মামা আমাদের জানিয়েছেন, আমরা যেন এমন প্রতিশোধ নিই, যাতে সমীন্দ্র অন্তত একবছর ধরে প্রত্যেকটি স্বামীহারা, সন্তানহারা মহিলার কান্না কেঁদে কেঁদে তবে মরে। ... আমরা কিন্তু সমীন্দ্রনাথকে মারাত্মক সাজা দেব। প্রতিশোধ নেব আমরা। তামাদি সিস্টেমের প্রত্যেকটা পায়া ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে আমরা একটা নতুন ভারত গড়বো একদিন।'

নিভা সাত্যকির সব কথা শুনলেন বাধা না দিয়ে। তাঁর মন গতকাল বিকেলে সমুর বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। স্বামীর গৃহমন্ত্রী হবার সম্ভাবনায় চিত্রার উচ্ছ্বাস, খুশিতে আনন্দে উদ্বেলিত চিত্রার মুখে হাসি, চোখে আনন্দাশ্রু— কোনটা ঠিক? মামা বলেছিল— 'মানুষের দুটো চেহারা থাকে। একটা মুখ, অন্যটা মুখোশ।' চিত্রার কোনটা মুখ আর কোনটা মুখোশ কে জানে?

জিজ্ঞেস করেন— 'সাত্তু, চিত্রাকে বলেছিস নাকি আমাকে ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে যাচ্ছিস প্লেনে?'

— 'না মা। ওর সঙ্গে পরিচয়ই তো হলো না। চিত্রাদি শুভ্রদাকে খবর দিল তুমি রাঁচির ট্রেন ধরবে বলে বেরিয়েছ।

শুভ্রদা আমাকে জানালো আর আমি আমার দলবল নিয়ে এখানে এলাম। চিত্রাদির সঙ্গে আমার সামনা-সামনি দেখা হয়নি কোনওদিন। শুভ্রদা আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকেই ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। শুভ্রদাই আসলে মাধ্যম।

আদেশের সুরে নিভা বলেন— 'ব্যাগ দুটো ওঠা। আমাদের এক্ষুণি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। তোর ছেলেদেরও সিগন্যাল দে কালবিলম্ব না করে হাওড়া স্টেশন ছেড়ে গোপন জায়গায় আন্ডারগ্রাউন্ড হতে। চল চল। এক মুহূর্তও নিরাপদ নয় এখন। এখানেই এ্যামবুশ করার সুযোগ বেশি। চল।'

অবাক গলায় সাত্যকি জিজ্ঞেস করে— 'এ্যামবুশ? কে কাকে করবে?' চলতে চলতে নিভা বলেন— 'আমরা মেইন এনট্র্যান্স দিয়ে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে যাবো না সাত্তু। প্রাইভেট বাসে গিয়ে মাঝখানে কোথাও নেমে ট্যাক্সি নেবো। ফ্লাইট কখন?

— 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তুমি কি করতে চাইছ! হঠাৎ করে কি হলো যে তোমার? ফ্লাইট রাত দশটা পনেরোয়। আমাকে বল কি হয়েছে?'— নিভার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করে সাত্যকি।

— 'সাত্তু, তুই বলেছিলি চিত্রা ঠিক বিদেশী স্পাই থ্রিলার বইয়ের ডাবল এজেন্টের মতো। একেবারে খাঁটি কথা বলেছিস। এই শব্দক'টা যদি না বলতিস তাহলে আমিও তোদের মতোই ধোঁকা খেয়ে যেতাম। চিত্রা সত্যিই ডাবল এজেন্টের কাজ করছে তবে তোদের ফেবারে নয়, ওর হাজব্যান্ডের ফেবারে সাত্তু! ও তোদের সমীন্দ্রর সম্বন্ধে হার্মলেস খবরগুলো দিত, আর তোদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ খবর সংগ্রহ করত। গতকাল সমুর মন্ত্রী হবার সম্ভাবনার খবর আসতেই চিত্রার মধ্যে যে খুশি, যে উচ্ছ্বাস আমি দেখেছি, সেটা স্বামীগরবে গরবিনী স্ত্রীর আনন্দে আপ্লুত অকৃত্রিম প্রকাশ। তার মধ্যে কোনও খাদ মেশানো ছিল না। ওর চোখের আনন্দাশ্রু মিথ্যে অভিনয় ছিল না। তোর বলা ভাষ্যের সঙ্গে ওর কালকের চেহারাটা একেবারেই মিলছে না। জানিস, সমু আমাকে বারবার তোর সম্বন্ধে প্রশ্ন করত, ইনফরমেশন চাইত। শুভ্রদার বোন মঞ্জুরী আমার বন্ধু। একদিন, ওদের বাড়িতে গেছি শুভ্রদার সঙ্গে দেখা হয়েছে বলতেই সমু বললো— ওকে তো বহু বছর ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন তাহলে বাড়িতে আসছে? দিদিভাই তুই কিন্তু আর ওদের বাড়ি যাস না।— ওর কথার মধ্যে একটা থ্রেট ছিল সাত্তু। আমার মনে হচ্ছে, সমু ওর জালে তোদের সবাইকে এবং সঙ্গে প্রাইজ ক্যাচ হিসেবে নিখিল মিশ্রর বিধবা ৬৭ বছরের নিভা মিশ্রকে তোলার ফন্দি এঁটেছিল। অনাহূতভাবে হঠাৎ আমার আগমনে ওর প্ল্যানটা সাকসেসফুল হবে ভেবে খুব খুশি হয়েছিল। গৃহমন্ত্রী হবার প্রাক্কালেই গভর্ণমেন্টের হাতে এতগুলো নক্সালের ট্রফি তুলে দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছিল, ও যা মুখে বলে সেটা কাজে করে দেখাতেও সক্ষম। আর এখন তো মন্ত্রী হয়েই গেল। অফুরন্ত পাওয়ার ওর হাতে। ও যে আমার খবর রাখতো সেটা বুঝেছিলাম। সাত্তু তাড়াতাড়ি পা চালা।'....

কলকাতামুখী লাইনে গিজগিজ করে সব যান ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে। ওদিকে হাওড়ামুখী রাস্তা ফাঁকা। প্রাইভেট বাসে বসা ওরা দু'জন উদ্বিগ্ন। একটু পরেই সি আর পি এফ প্লেট লাগানো ধব্‌ধবে সাদা নতুন ধরনের একটা গাড়ি গেল। তারপরই পরপর আরও দুটো যাচ্ছে স্টেশনের দিকে। তিনটে গাড়ির পরই সিলভার গ্রে কালারের ইনডিকা গাড়িটা। খোলা জানালার পাশে বাঘের মতো সোজা হয়ে বসে আছে চিত্রা। — 'সাত্তু ওই গাড়িতে চিত্রা বসে, ওই দ্যাখ। এই গাড়িটাতে করেই আমি মঞ্জুরীদের বাড়ি গেছি।' — সামনে কোনও অবস্ট্রাকশনের জন্য ইনডিকা গাড়ি এবং ওটার পেছনে আরও তিনখানা সাদা জীপ একটু সময়ের জন্য থেমে ছিল। — 'সাত্তু রে, চিত্রা নিজে আমাকে ধরার জন্য রিজার্ভ ফোর্স নিয়ে হাওড়া স্টেশনে যাচ্ছে। সমু অ্যাকশন শুরু করে দিয়েছে চিত্রার ফোন পেয়ে। শুভ্রদা এ্যারেস্ট হয়ে গেছে নিশ্চয় এতক্ষণে। সমু আর আমার ভাই নয়, শত্রু!' — 'মা, আমাদের প্ল্যান চেঞ্জ করতে হবে। ওরা এয়ারপোর্টেও নজরবন্দি করবে। বড়বাজারে নেমে পড়ব আমরা। ওখানে আমাদের একটা সেফ হাউস আছে। আবহাওয়ার খবর না নিয়ে সেফ হাউস ছেড়ে বেরোব না।' — বলল সাত্যকি।

ওদিকের পুলিশ কনভয় চলে যেতেই যানবাহন, বাসও কচ্ছপগতিতে গড়াতে শুরু করল। নিভা সাত্যকির হাতখানা শক্ত করে ধরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার গলায় নীচু স্বরে বললেন— 'সাত্তু আজ থেকে আমি তোদের দলে নাম লেখালাম। মানুষ কেন প্রতিশোধস্পৃহ হয় আজ বুঝলাম।'

— 'আমাদের সামনে তুমি সবসময় ছিলে মা। আদর্শ শিখিয়েছিলে বলেই প্রাণ বাজি রাখার সাহস পেয়েছি। আজ তোমার উপস্থিতবুদ্ধির জন্য আট-টা ছেলের জীবন বাঁচলো।'

— 'জানিস, মামা বলেছিল— প্রতিশোধ নে নিভা। তখন প্রতিশোধস্পৃহা ছিল না। কিন্তু এখন হচ্ছে। শুধু সমু নয়, চিত্রার ওপরও প্রতিশোধ নেব। আমি চণ্ডী হয়ে উঠব। যে মামার মতো বিশুদ্ধ আত্মার দেবতাকে প্রতারণা করেছে, তাকে নিধন করব। ওরা আমার শেষ জীবনের ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে আতঙ্কিত হবে। আমার দিন শেষ হবার আগে ওদের শেষ করতে চাই সাত্যকি। হার্টের রোগে না মরে, 'ফিদাইন' হয়ে মৃত্যুকে এখন বেশি বরণীয় মনে হচ্ছে সাত্তু। তোরা আমাকে মানব বোমা হিসেবে ব্যবহার করতে পারিস অশুভ শক্তি ধ্বংস করার জন্য। রাজী?'

— 'নিশ্চয় মা। তবে তোমাকে নয়, আমরাই তো আছি।' □

অলৌকিক ঘরের সন্ধান

দীপঙ্কর দাস

বাঁ হাতে একটা থান ইঁট আড়াআড়ি ভাবে ধরে ডানহাতের বাশুলি দিয়ে আলতো টোকা মারল দিবাকর। ব্যাস, তাতেই একটা গোটা থান ইঁট এখন সমান ভাগে দু'খণ্ড হয়ে গেল। যে দেখলে মনে হবে বাশুলির আঘাতে নয়, বুঝি কোনও ইঁট-কাটা করাতের ফলা আড়াআড়ি ভাবে সমান দু-ভাগে কেটে দিল থান ইঁটটাকে। এতটুকু আঁকাবাঁকা রেখা নেই। এমনই দুই খণ্ড হলো ইঁট।

দুই খণ্ড ইঁটের একটি খণ্ড হাতে নিয়ে দিবাকর বাশুলি ফেলে ডান হাতে কর্ণি তুলে নিল। হাতের নাগালে এক-পাঁচের সিমেন্ট বালির মশলা ভর্তি মশলা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা উত্তরার সঙ্গে একবার যেন চোখাচুখি হলো। তবে ওই পর্যন্ত। দিবাকরের যে বিশেষ কোনও ভাবান্তর হলো এমন নয়। নিঃশব্দে গামলায় কর্ণি ডুবিয়ে সিমেন্ট বালির মশলা থেকে কিছুটা মশলা তুলে নিয়ে গেঁথে তোলা দেওয়ালের খাঁজে মশলা ঢেলে এমনভাবে বাঁ হাতের আধলা ইঁটটাকে গুঁজে দিল খাঁজে যেন ফুট ইঞ্চির মাপকাঠি দিয়ে দিবাকর গাঁথুনির খাঁজের মাপ নিয়ে থান ইঁটটাকে দু-ভাগ করেছে। ফলে খাঁজে আধলা ইঁটটা গুঁজে দেওয়ার পর দু-পাশে একসুতো ফাঁকও রইল না।

দিবাকরের চোখের আন্দাজ ক্ষমতা চেয়ে চেয়ে দেখছিল উত্তরা। ফলে মাথায় করে বয়ে আনা মশলা ভর্তি কড়াইটা মাচানের ওপর নামিয়ে রেখে খালি কড়াইটা নিয়ে পুনরায় মশলা ভর্তি করে নিয়ে আসার কথাই যেন ভুলে গেছিল উত্তরা। ওদিকে ইঁট বিছিয়ে তার ওপর পলিথিন চাপিয়ে পাটাতন বানিয়ে মশলা মেশাচ্ছে কালী, শঙ্কররা। বালির স্তূপ থেকে ড্রাম ভর্তি করে বালি তুলে এনে পাটাতনের ওপর উপুড় করে ঢালছে রেজিনা, শান্তিরা। সিমেন্টের বস্তার মুখের সেলাই খুলে ড্রামে করে সিমেন্ট এনে ফেলছে পাঁচ ড্রাম বালির স্তূপের ওপর। তারপর জল মিশিয়ে কোদাল-বেলচা দিয়ে মশলা তৈরি করে কালী -শঙ্কররা হাঁক পাড়ছে— ও উত্তরা, ওরে মেয়ারা সব। নে, নে মশলা তুলে নে মা। রোদের যা ঝালা পইড়েছে, টুকুন দেরি করলে মশলা জমাট বেঁধে যাবে। তখন ঠিকাদারবাবু সে মাথা চিবায়ে খাবে।

কথাটা খুব ভুল বলেনি কালী, শঙ্কররা। বৈশাখ পেরিয়ে জ্যৈষ্ঠ চলছে। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে রোদের ঝালা। রাজ্যের পশ্চিম প্রান্ত সীমার এই জঙ্গল মহলে ফি বছর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে সারাদিন সূয্যি ঠাকুর আকাশ থিকে ঝালা নামায়। সেই আগুনে যে কেবল একিককার মাঠ-ঘাট, নালা নর্দমা, খালি-ডাঙ্গা ফেটে ফুটে চৌচির হয়ে যায়, এমন নয়। এক সরা জল রোদে ধরতে না ধরতেই সরা খালি। সবটুকুন জল চোখের পলক পড়তে না পড়তে কপ্পুরের মতো উধাও। সব জল তো প্রায় ওই সূয্যি ঠাকুরই। তার ওপর আবার পাঁচ ড্রাম বালি আর এক ড্রাম সিমেন্টের সঙ্গে জল মিশিয়ে বানানো মশলা যদি খোলা পড়ে থাকে বেশিক্ষণ তাহলে সেই মশলা থেকে সবটুকু জল উবে গিয়ে মশলাকে ডেলা পাকিয়ে ফেলতে আর কতক্ষণ লাগার কথা। চারদিকে যখন এমন সর্বগ্রাসী তৃষ্ণা, সেই তৃষ্ণা থেকে জল মেশানো মশলা নিয়ে গড়িমসি করলে যে সব বরবাদ। তাই যেইমাত্র মশলা প্রস্তুত হচ্ছে, সেই মাত্র কড়াই বোঝাই করে রাজমিস্ত্রিদের কাছে পৌঁছে না দিলে যে মহাসর্বনাশ। বিকালে সারা দিনের কাজ বুঝে নিতে এসে ঠিকাদারবাবু যদি দেখে, শুকনো মশলা ডেলা পাকিয়ে স্তূপাকার হয়ে আছে মাঠের ওপর, তখন তো দৈনিক মজুরি থেকেই ওই ডেলাপাকানো মশলার সিমেন্ট বালির দাম কেটে নেবে।

বাঁদিকে ঝাড়গ্রাম-জামবনি সড়ক। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার প্রকল্পের টাকায় নির্মিত সড়ক। ঝাড়গ্রামের পেপারমিল মোড় থেকে বেরিয়ে উত্তর মুখো ছুটে গিয়ে মিলেছে জামবনির গঞ্জের সঙ্গে। সড়কের পাশে পরপর আট-দশটা গুদামঘর তৈরির কাজ চলছে। এদিকে গুদামঘরের বড় অভাব। তার ওপর এই টানার দেশে ফসল যা হয় সবটাই হয় ওই বর্ষার জলে। ফলে ফি বছর অঘ্রানি ধানটুকু উঠতে না উঠতেই ভাগাড়ে গরু পড়ার ঘ্রাণ পেয়ে শকুনি সদৃশ দালালরা এসে হাজির হয় চাষীর ক্ষেতের পাড়ে। চাষীকে আর ধান কাটতে হয় না। তার আগেই ক্ষেতকে ক্ষেত জলের দরে কিনে নেয় ওই শকুনের দল। উপায় কি? ধান কেটে ক্ষেতের ধান মজুত করবে কোথায় ওই গরিবগুর্বা চাষির দল? ঝাড়গ্রাম শহরের কেন্দুতলায় যে দু-চারটি গুদামঘর আছে ব্যাপারীদের, সেই গুদামঘর ভাড়া নিয়ে ধান মজুত করার ক্ষমতা নেই এই চাষীদের। ফলে মাঠের ধান মাঠেই বিক্রি হয়ে যায়। শকুনিরা জলের দরে ক্ষেত কিনে মজুর দিয়ে ধান কাটিয়ে ম্যাটাডোর বোঝাই করে লোধাশুলির মোড়ের বোম্বে রোড পেরিয়ে গোপীবল্লভপুর, তালপাটির মজুতদারদের কাছে চড়া দরে বিক্রি করে দেয়। মজুতদার বা রাইসমিলে ধান ভাঙিয়ে বস্তা বস্তা চাল বানিয়ে চালান দেয় সদরে দ্বিগুণ দরে। বেচারা চাষী জানতেও পারে না তার ঘামরক্ত জল করা, মহাজনের ঋণে গলা পর্যন্ত ডুবে যাওয়া ফসল কতগুণ বেশি দরে শহরের বাবুদের দু-বেলার পাতে ভাত হয়ে পরিবেশিত হল।

এই কারণে গুদামঘর তৈরি করাচ্ছে সরকার। এই গুদামঘরে চাষীরা নিজের নিজের ফসল মজুত রাখবে। সরকার কিনে নেবে সেই ফসল ন্যায্য দরে। মাঝখানে শকুনদের উৎপাত নেই। চাষীদের কিছুটা সুরাহা হবে। বাজারের গরিব খদ্দেররাও কিছুটা স্বস্তি পাবে।

ক্ষুদ্র ডিপার্টমেন্টের গোটা কাজের টেন্ডার পেয়েছে খেমাশুলির

তপন মাইতি কন্সট্রাকশন।
বছরখানেক আগেও এই এলাকায় কোনও কাজকর্ম করার কথা ভাবাই যেত না। কেবল ফুড ডিপার্টমেন্ট নাকি? পি ডব্লিউ ডি থেকে শুরু করে ওই সেচ দপ্তর— তাদের সদরের অফিসে কত কাজের টেন্ডার ডাকত ইঞ্জিনিয়ার বাবুরা। কোথাও হবে ইন্দিরা আবাস যোজনার ঘরবাড়ি, কোথাও রাজীব গান্ধী গ্রামীণ দল সরবরাহের কয়েকশো ডিপ টিউবওয়েল, কোথাও বা কংসাবতীর বালির চড়ার নীচে থেকে পাম্প করে জল তুলে সেই জল পরিশোধন করে গ্রামে গ্রামে পৌঁছানোর জন্য জলপ্রকল্পের কাজ হবে। তবে ওই টেন্ডারই ছিল সার। কোনও ঠিকাদার বাবুর কলিজায় এতখানি দম ছিল না যে টেন্ডার দিয়ে কাজ নেওয়ার। কারণ, জঙ্গলমহলে কাজ শুরুর জন্য মাটি কাটা শুরু হলেই হানা দিত মুখে-মাথায় গামছা বাঁধা, কাঁধে একে-৪৭ রাইফেলধারী যমদূতরা। ঠিকাদারবাবুর ওপর হুকুম হতো— এতটাকা দাও। না হলে গুলি খাও। টাকার পরিমাণটা এমন অঙ্কের হতো যে ঠিকাদারবাবুরা বিনা পয়সায় গুলি খাওয়াকেই মেনে নিত।

সেই সময় ঠিকাদারবাবুরা এদিকে ঘেঁষতো না। তাদের জন্য সারা রাজ্য আছে। মায় সারা দেশ আছে। বিনপুর, সাতপাটি, জামবনি, ভেদিয়াশোল, বেলপাহাড়িতে কাম না করলেও তাদের পেটের ভাতের অভাব হতো না। কিন্তু মরতে বসেছিল তো দিবাকর, জগন্নাথ, কালী, শঙ্কর, উত্তরা, রেজিনা, জাহাঙ্গীর, বাসন্তীরা। এদের তো আর জামিদারি নেই। সেই কোনকালে ছ'নম্বর জাতীয় সড়ক নির্মাণের সময় এদের পূর্বপুরুষরা মাটি কাটা, পাথর ভাঙা, পিচ গলানো— অর্থাৎ জাতীয় সড়কের মতো হেভি ট্রাফিক বহনকারী সড়ক নির্মাণের জন্য যাবতীয় কাজ করার জন্য ধলভূমগড়, কানাইশোর, চাকুলিয়া, ঘাটশিলা, দলমা পাহাড় ছেড়ে ঠিকাদারদের ডাকে সাড়া দিয়ে নেমে এসেছিল সমতলে। তারপর থেকে কয়েক প্রজন্ম কেটে গেছে। কারোর আর পূর্বপুরুষের ভিটেমাটিতে ফেরা হয়নি। আর বর্তমান প্রজন্ম তো ভুলেই গেছে যে তারা ওই জঙ্গলমহল এলাকার ভূমিপুত্র নয়। বেশ কয়েক পুরুষ আগে তাদেরই পূর্ব পুরুষরা রাঁচি-টাটানগর-যদুগোড়ার পাহাড় অরণ্য ছেড়ে চলে এসেছিল এদিকে সড়ক নির্মাণের কাজ নিয়ে।

আস্তে আস্তে সড়ক নির্মাণের কাজ থেকে শুরু করে এরা যুক্ত হয়েছে গুদামঘর, দালান কোঠা, এমনকি সরকারি দপ্তরের কর্মীদের বাসস্থান নির্মাণের কাজেও। এদের মধ্যে নির্মাণ শিল্পের প্রতি যেন সহজাত দক্ষতা রয়ে গেছে। যেমন দিবাকর, যেমন জগন্নাথ কিংবা সিরাজ কিংবা আলাউদ্দিন। এরা মূলতই রাজমিস্ত্রি। হয়তো নিজেদের মনে পেশাগত অহঙ্কারকে লালন করে। রাজমিস্ত্রির পেশা থেকে ভিন্ন কোনও কাজে যেমন ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইন বসানোই হোক কিংবা সড়ক নির্মাণের কাজই হোক— নিযুক্ত হতে তাদের অহঙ্কারে বাধে। কিন্তু উত্তরাদের বিশেষ কোনও গুমর নেই। তারা তো মূলতই কামিন, প্রধান মিস্ত্রিদের কাজের মাল মশলা সরবরাহ করাই তাদের কাজ। কিন্তু ওই মাথায় মুখে গামছা বাঁধা কাঁধে বিলাইতি রাইফেল ঝোলানো বন-পার্টির অত্যাচারে যখন এদিকের ত্রিসীমানায় কনট্রাক্টারবাবুরা ঘেঁষা বন্ধ করে দিয়েছেন, তখন তাদের অনাহারে দিন কাটানো ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। তখন দিবাকর, জগন্নাথরা যে মাঝেমধ্যে জঙ্গলমহল ছেড়ে ঝাড়গ্রাম রেলস্টেশন থেকে ট্রেন ধরে হাওড়া-কলকাতার দিকে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা যে করতো না এমন নয়। কারণ ওদিকে কেবল সরকারি কাজকর্মই যে হয় এমন নয়, প্রোমোটারবাবুরাও একের পর এক আশমান ছোঁয়া উঁচু ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি করছে। একবার ওখানে গিয়ে পৌঁছাতে পারলে আর যাই হোক নিষ্কর্মা বসে বসে হাঁটু জোড়ায় বাত ধরিয়ে ফেলার হাত থেকে বাঁচা যাবে।

কিন্তু যাওয়া আর হয়নি কারোর। এই শাল-মহুয়া শিরিষ-তেঁতুল, অর্জুন, বহেড়া গাছের ঘন শাখা-প্রশাখায় নিশ্চিদ্র ছায়াঘেরা জঙ্গলমহল, লাল স্যাটেরাইট আর কালো গ্রানাইট পাথরের আবরণে ঢাকা শুখা মাঠ-প্রান্তরের আশ্রয় ছেড়ে বড় টৌন-এ জীবিকার খোঁজে গিয়ে টৌনের বৃক্ষহীন, মাঠ-প্রান্তরহীন ইঁট-বালি সিমেন্ট-লোহা-কংক্রিটের জঙ্গলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে তাদের পূর্বপুরুষরা, তার কিছু গল্পগাথা যে তাদেরও শোনা আছে। এই যেমন উত্তরা। ওর মা অতসীর মরদ কাশীনাথটার চোখে কে যে রঙিন স্বপ্ন ধরিয়ে দিয়েছিল, কে জানে। অতসী আর কাশীনাথ তখন কাজ করে সড়কের ঠিকা নেওয়া ঠিকাদার কাজল ঘোষের গ্যাংয়ে। খেমাশুলির স্টোন কোয়ারি থেকে লরি বোঝাই পাথর নিয়ে এসে লোধাশুলির স্টকে জমা হওয়া পাথর ভেঙে দুজনে যা উপার্জন করত— মেয়াকে নিয়ে দু'বেলা ভারত-কাপড়টা ঠিক চলে যেত। কিন্তু সাঁকরাইলের বড় ঠিকাদার রতন ঘোষ, সে ছিল খেমাশুলির স্টোন কোয়ারির মালিক রজত প্রতিহারবাবুর বড় খদ্দের— সারা দিনে পাঁচ পাঞ্জাব

Autoply Harness Industries

Commerce House (1st Floor, Room No. 3-A)

Manufacturers of

Autoply® BRAND

Automobile Wiring Harness, PVC Auto Cable, Battery Cable, PVC Tape, Wiring Terminal and Auto parts

2, Ganesh Chandra Avenue
Kolkata - 700 013

Phone : 2213-2971, 2213-2907

Durga Puja Festival Greetings to All Our Customers, Patrons and Well Wishers.

MAZZA DENIM

Incense Sticks

Now you can capture the beauty of an experience light-up and unfold a thousand petals.

Shashi Industries

Bhabnagar - 364 001
Bangalore - 560 010

Rahul Enterprises

40, Strand Road, Fourth Floor, Room No.4,
Kolkata - 700 001
Phone : 2243 1722 / 1447, Fax No. 033 2243 3922
E-mail : aksadt_saboo@yahoo.co.in

Leading Raw Meterial Supplier to Paper Mills :

Bamboo, Hardwood, Bamboo Chips and Waste Paper & Transporter, Handling & Commission Agent.

Pan No. AACHA0716 M

গাড়ি ভর্তি পাথর যেত তার সাইটে। কারণ রতন ঘোষ তখন কোনা এক্সপ্রেস-ওয়ে নির্মাণের ঠিকা নিয়েছিল। সেই রতন ঘোষের লরির হেল্পার যে কি মন্ত্র শুনিয়েছিল অতসী আর কাশীনাথের কানে, কে জানে। একদিন খেমাশুলির স্টোন কোয়ারির কাজ ছেড়ে এক সর্দারজীর লরিতে উঠে বসেছিল মুম্বাই শহরে যাবে বলে। একবার মুম্বাই পৌঁছাতে পারলে আর দুই হাতের তালুতে হাতুড়ির বাঁটের কড়া ফেলে পাথর ভাঙার কাজ থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তি মিলবে এমন নয়। মুম্বাই শহরের ফিল্মী দুনিয়ায় কেবলমাত্র এক্সট্রা হয়ে হিরো হিরোইনদের সঙ্গে কোমর দুলিয়েই দৈনিক এক হাজার, দেড় হাজার। আর কপালে যদি লেখা থাকে তবে হয়তো অতসী একদিন কোনও ফিল্মীবাবুর নজরে পড়ে গিয়ে....। ব্যাস, ব্যাস। এরপরেও যদি শিবনাথের মাথাটা না ঘুরে যায়, তাহলে আর কত কথার পরে ঘুরবে! হেলপার তো বলেই দিয়েছিল, মুম্বাইয়ের ফিল্মী দুনিয়ার হিরোইনদের কথা তো তার কম জানা নেই। তারা ফিল্মীর পর্দায় যতই হুরি-পরির মতো দেখাক না কেন, সবই মেক-আপ আর ক্যামেরার কারসাজি। আমাদের অতসীকে এক হপ্তা রোদ থিকে আড়ালে রেখে 'ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি' মাখিয়ে ঠাণ্ডা ঘরে রেখে দিলেই মুম্বাইয়ের তাবড় তাবড় হিরোইনিরা একেবারে ডাউন খেয়ে যাবে। তাছাড়া আজকাল হিরোইনদের কাছ থেকে কেউ অ্যাকটিং দেখতে চায় না। একরকম নগ্ন শরীরে আইটেম ড্যান্স দেখার জন্যই হলে ভিড় করে। অতসী খুব পারবে। ফলে সর্দারজীর পাঞ্জাব লরিতে দু'জনকে তুলে দিয়ে মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়ে দিতে হেলপারের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। লরির চালক গুরবিন্দর সিংজির সঙ্গে দু'হাজারেই রফা হয়ে গেছিল। শিবনাথ আর অতসী জানবে কেমন করে যে গুরবিন্দরের কাজটাই হচ্ছে মুম্বাই বন্দর মাফিয়াদের কাছে শক্তসমর্থ নারী-পুরুষ সাপ্লাই দেওয়া। আর মাফিয়াদের কাজই হচ্ছে আরব দুনিয়ার তেলখনির মালিকদের কাছে ক্রীতদাস হিসেবে এদেশের জোয়ান সমর্থ নারী-পুরুষকে বিক্রি করা। ওদেশে নাকি দেশীয় মানুষদের আর কোনও তেলখনির মালিকদের প্রাসাদ ক্রীতদাস তো পরের কথা, সামান্য ঘরের কাজে নিযুক্ত করতে হলেও সরকারি দপ্তর থেকে অনুমতি নিতে হয়। আর সরকারের বেঁধে দেওয়া মিনিমাম ওয়েজ দিতে হয়। যার পরিমাণ এদেশের অনেক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের মাসিক উপার্জনের চেয়েও অনেক বেশি।

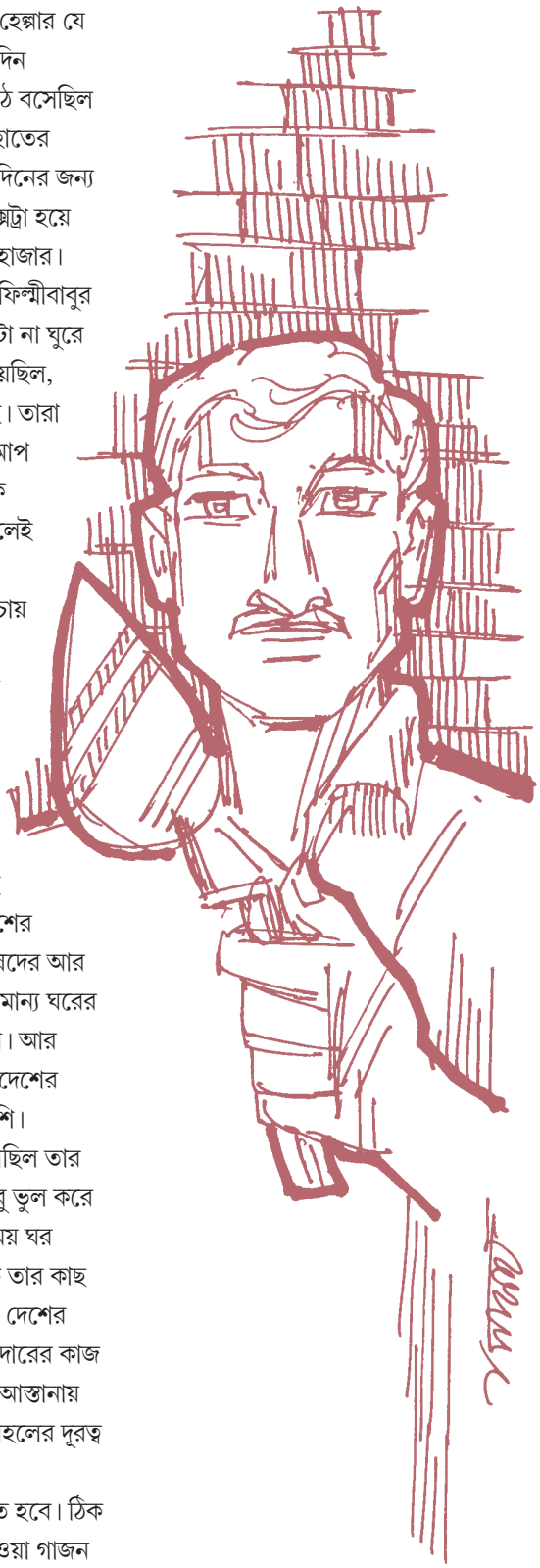

উত্তরা খেমাশুলির স্টোন কোয়ারি আস্তানা ছেড়ে ফিরে এসেছিল তার বাপের সঙ্গীদের কাছে। দেখতে দেখতে একটা যুগ কেটে গেল। তবু ভুল করে কোনওদিন সড়কের কাজ করেনি। সড়ক বড় বেশি প্রতারক। সবসময় ঘর ছাড়ার কু-মন্ত্র দেয় কানে। এই সড়কই তো একদিন তার বাবা-মাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছিল। এখন হয়তো তার বাবা আর মা আরব দেশের কোনও ধনকুবের তেলখনির মালিকের প্রাসাদে বিনা মজুরিতে ঘরদোরের কাজ করে। আর রাতে সেই মালিকের প্রাসাদের বাইরে চাকর-বাকরদের আস্তানায় সর্বাঙ্গে চাবুকের জ্বালা নিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবে সেখান থেকে জঙ্গলমহলের দূরত্ব ঠিক কতখানি!

মাথার ওপর সূর্যটা যেন নিজের রোষেই নিজে ভস্মে পরিণত হবে। ঠিক যেন গাজন পরবের দিনে কংকালী মন্দিরে মাঠবসা মেলায় ভাঙ খাওয়া গাজন সন্ন্যাসীর মতো রোষ তার। সেই সঙ্গে রোদের ঝালায় চারদিকে সাদা রঙের চিক

নেমেছে। ওদিকে সিমেন্ট বালির ধুলো, আর মশলা বানানোর কাজে নিযুক্ত কালী, শঙ্করের হাঁক— হেই মেয়েরা, আর একটু পা চালা বাপু। এবারের লট্‌টা ফুরালে অন্তত এবেলার মতো ছুটি।

তা ঠিক। এমন গরমে এখন কাজ চলছে দুই শিফ্‌টে। সকাল ছ'টা থেকে দশটা। আবার বিকেল চারটে থেকে রাত আটটা। ঠিকাদারবাবুও লেবারদের এখন বেলা দশটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত মাঠে ছোটাছুটি করে কাজ করাবার সাহস পায় না। যে হারে লু বইছে সারা দুপুর, এর মধ্যে মজুর মিস্ত্রিদের খাটালে একটা দুটো মজুর মিস্ত্রি যদি হুমড়ি খেয়ে পড়ে মারা যায়, তাহলেই তো থানা-পুলিশ। বিডিও অফিসে শুনানি। লেবার ইন্স্যুরেন্সের মোটা টাকা— সব মেটাতে মেটাতে মাঠের কাজ সাতদিন বন্ধ। সে যে বড় লোকসান। তাই বর্ষা না আসা পর্যন্ত দিনে দু শিফ্‌টের ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে ঠিকাদারবাবু। তবে সেকেন্ড শিফ্‌টের কাজের জন্য অনেকগুলি হ্যাজাকের খরচ বইতে হচ্ছে তাকে। কারণ ছ'টা থেকে আটটা— এই দু'ঘন্টায় প্রকৃতির আলো এতটাই কমে আসে যে সেই আলোয় গাঁথনির কাজ করা কঠিন।

আজকের মতো কাজ ফুরালো। রাত আটটার ঘর পেরিয়ে যাওয়ার পর দিবাকর উত্তরারা তাদের শরীরের শেষতম শক্তিকে বিন্দু বিন্দু ঘামে পরিণত করে ওয়ার্ক-সাইটের ধুলোয় ঝরিয়ে দিয়ে পা টেনে টেনে শরীরগুলিকে নিয়ে চলল তাদের টিউটিচটির মাঠে অস্থায়ী গড়ে ওঠা লেবার কলোনীর দিকে। ওয়ার্ক সাইটের দায়িত্ব এখন ঠিকাদারবাবুর নিযুক্ত চৌকিদারদের। পাহারায় সুবিধার জন্য হ্যাজাকগুলি নেভানো হয়নি। কারণ ওয়ার্ক সাইটে তো কম মূল্যবান বস্তু মজুদ করা নেই। যেমন অস্থায়ী ভাবে টিনের চালাঘরের ভেতর মজুত করা আছে টন টন সিমেন্টের বস্তা। ওদিকে স্ট্যাস ইয়ার্ডে পড়ে আছে টন টন লোহার রড। কোনওটা বা বারো মিলিমিটারের, কোনওটা ষোল, কোনওটা বা বিশ মিলিমিটার ডায়মিটার। রাতের অন্ধকারে এরকম কয়েক টন লোহা ট্রাকে তুলে নিয়ে পালাতে পারলে ঝাড়গ্রামের যে কোনও কালোয়ারের দোকানে সকাল হওয়ার আগেই কয়েক হাজার টাকা হাতে চলে আসবে। এছাড়া নির্মাণের কাজের মূল্যবান অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সব। ফলে পাহারা দেওয়ার জন্য ঠিকাদারবাবুকে অনেক চৌকিদার নিয়োগ করতে হয়েছে।

রাতের বেলায় কুলি লাইনের বস্তিতে ফিরে এসে চুলা ধরায় না কেউ। দুপুরে দশটা থেকে চারটে— এই ছ'ঘন্টার যে ছুটি পায় মজুর মিস্ত্রি, কুলি-কামিনের দল, তখন বস্তিতে ফিরে চুলা ধরিয়ে যে যার মতো দু-বেলার রুটি সব্জি বানিয়ে নেয়। দুপুরের খাদ্য গ্রহণ করে রাতের খাদ্য মাটির পাত্রে তুলে জলভরা গামলায় রেখে দেয়। ফলে দুপুরের এমন পাথর ফাটানো তাপেও খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয় না। রাতের খাবার খেতে খেতে রাত বুড়িয়ে যায়। তারপর কেউ আর বস্তির ঝুপড়ি ঘরে ঢোকে না। এমন বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের রাতে বস্তির নিচুচালার ঘরে শুলে পরে পরদিন সকালে যে কেউ সেদ্ধ হয়ে যাবে। ফলে সবাই যার যার মতো টিউটি চটির মাঝে চারপাই পেতে ঘুমায়। দিনটা যতই তপ্ত হোক, সূর্যাস্তের পরপরই এদিকের পাথুরে মাঠঘাট অতি দ্রুত সারাদিনের সংগ্রহ করা তাপ বিকিরণ করতে শুরু করে। রাত আটটার পরে পাথর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তখন অদূরে বনভূমির দিক থেকে জোরে শীতল বাতাস বইতে শুরু করে। চারপাই-এর ওপর শরীর এলিয়ে দিলেই ঘুমের অতলে তলিয়ে যায় শরীর।

দিবাকরের খাবারটা উত্তরাই তৈরি করে দেয়। এই দিবাকর একযুগ আগে যখন সবে পনেরো কি ষোলো বছরের যুবক, বাপ-মার ফেলে যাওয়া আট বছরের কিশোরী উত্তরা যখন দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘুরে মরছে, তখন বিনপুরের গঞ্জে আশ্রয় পেয়েছিল এই দিবাকরের কাছেই। সেই সময় খরিদাবাগানে টেলিফোন কোম্পানির বাবুদের কোয়ার্টারের কাজ নিয়েছিল ঝাড়গ্রামের মস্ত ঠিকাদার নিরঞ্জন পানিগ্রাহী। দিবাকররা রোজ সকালে বিনপুরের গঞ্জের নতুনচটির মাঠে জমা হতো। ঠিকাদারের লরি এসে তুলে নিয়ে যেত সবাইকে ওয়ার্ক সাইটে। বয়স পনেরো ষোলো হলে কি হবে, দিবাকর তখন থেকেই পাকা রাজমিস্ত্রি হয়ে উঠেছে। যেন ইটের দালান নয়, কোনও দক্ষ স্যাকরার মতো ছোট ছোট ছেনি-হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে সীতাহারের গায়ে খোদাই করে চলেছে মনের হাজার নক্সা। যেখানে আর দশটা রাজমিস্ত্রি দুই রদ্দা ইঁট গাঁথার পরেই ওলোন-দড়ি ঝুলিয়ে পরীক্ষা করে নেয় গাঁথুনি ঠিকঠাক সোজা হয়ে উঠছে কিনা। নাকি হেলে পড়ছে কোন দিকে। তখন দিবাকর একটানে ইঁট গেঁথে গেঁথে গোটা দেওয়ালটাই গেঁথে ফেলে। না লাগে ওলোন, না লাগে গজ- ফুটের টেপ।

সেই দিবাকর উত্তরাকে বলেছিল— আজ থিকে তুয়াকে আমার জোগাড়ে করি নিলাম। দেখিস যোগান যেন ঠিকঠাক দিস।

সেই থেকেই তো শুরু। দীর্ঘ বারো বছর ধরে উত্তরা দিবাকরকে জড়িয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। যেমন যেমন বয়স বেড়েছে উত্তরার, দিবাকর তেমন তেমন করে কাজ শিখিয়েছে তাকে। উত্তরাও দিবাকরকে লতার মতো জড়িয়ে বাড়তে বাড়তে একদিন টের পেয়েছে দিবাকরের সারা শরীরে ঘামের মতো লেগে থাকা বালি সিমেন্টের গন্ধটাকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুকের দুই ফুসফুসে টেনে না নিতে পারলে সারা দিনের গতরভাঙা পরিশ্রম করেও রাতে তার ঘুম আসে না। ফলে পরদিন দিবাকরের জোগাড়ের কাজে মনও বসে না। তখন বিরক্ত হয় দিবাকর উত্তরাকে ধমক দিয়ে বলে— তুয়ার আজ হইয়েছেটা কি বলতো? হিলতে দুলতেই বেলা কাবার কইরে ফেলছিস! শরীর কি রাজকন্যার আলিস্যি ভর কইরেছে? রাজকন্যার শরীরে বিনা কায়িকশ্রমে ঠিক কি রকম আলস্য ভর করে থাকে, মাত্র আট বছর বয়সেই বাপ-মায়ের পরিত্যক্ত মেয়ে উত্তরা বিশে পা দিয়েও জানে না। তবে কুলি লাইনের বস্তির নিচু চালাঘরের মেঝেয় মাত্র হাত দেড়েক তফাতে মড়ার মতো ঘুমিয়ে থাকা কালো গ্র্যানাইট পাথরে খোদাই করা দিবাকরের শরীরের উত্তাপ থেকে বঞ্চিত হয়ে রাত কাবার করার পরে সকালে উত্তরা টের পায় তার সুঠাম শরীরটা যেন বর্ষায় ভেজা শাল পাতার মতো নেতিয়ে আছে। সেই নেতানো শরীর টেনে দিবাকরকে মশলার যোগান দিতে আলস্য তো ঘিরবেই। তবু দিবাকরের এক রা— আগে ঘর তুলি। তার পরে বিয়াসাদি।

বিয়াসাদি না হলে পরে বুঝি শরীল জাগে না? উত্তরা কতদিন লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে দিবাকরের পাথরের চটাং-এর মতো বুকে মুখ ঘঁসতে ঘঁসতে বলেছে— আমাদের গ্যাঙে ওই যে রেজিনা, বাসন্তী, লক্ষ্মী, জাহানারারা আছে, উয়ারা যে শঙ্কর, কালী, জগন্নাথ, সিরাজের সঙ্গে শরীরের সুখ দেওয়া নেওয়া করে রাতে। উয়ারা কবে বাম্মা সাক্ষী কইরে বিয়াসাদি কইরল বল?

উয়াদের কথা, আর তুয়ার কথা কি এক হইলোরে মেয়া। আমি যে সেই কোনকালে তুয়ারে আমার জোগাড়ে কইরে নিছি। উয়াদের আর কি? এক জায়গার কাজ ফুরাবে, ব্যাস গ্যাঙ ছাইড়ে আর এক ঠিকাদারের গ্যাঙে ঢুইকে পইড়ে কে কুথায় চইলে যাবে ঠিক কি! কিন্তু আমি তো তুয়াকে একলা ফেইলে কুনদিন কুথাও যাব না। দায়িত্ব বলে একটা কথা আছে না! আর ক'টা দিন সবুর কর মেয়া। তারপরেই ঘর বানাবো। সরকার নাকি নিজের ঘর নিজে কর প্রকল্পের জইন্য তিনকাঠা জমির পাট্টা দিবে আমাদের মতো যাযাবর দিগকে। ঘর হলি পরেই তুই হবি আসল জোগাড়ে। মাঠের, ঘরেরও।

দিবাকরের এই আশ্বাসবাণী শুনে মনকে শান্ত করে উত্তরা। তবু সময় সময় আবার অস্থির হয়ে উঠে। যেমন আজ মধ্যমাসে অস্থির হয়ে উঠল উত্তরার শরীর।

আজ মধ্যরাতেও বাতাসের শরীর থেকে দিনদুপুরের তাপ ঝরেনি এক বিন্দু। সারা দুপুর লু ছুটেছে মাঠ-প্রান্তরের ওপর দিয়ে। সেই লু বাতাসও এখনও জড়িয়ে আছে জঙ্গলমহল থেকে ছুটে আসা বাতাসে। মাঠ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গ্র্যানাইট পাথরের চাঙড়গুলিও যেন সারা দিনের সঞ্চিত তাপ অতি বড় কৃপণের মতো সঞ্চয় করে রেখেছে সর্বাঙ্গে। তাপ মোচন করে শীতল হওয়ার কোনও ইচ্ছাই যেন নেই মাঠ-প্রান্তরের। এমন রাতে মাঠের ওপর চারপাই পেতেও দু-চোখে ঘুম আনানো যায় না। চরাচর জুড়ে মধ্যরাতের ভৌতিক নিস্তব্ধতার ভেতর যখন মা বসুমতিও অতৃপ্ত রতি কামনায় অস্থির হয়ে উঠেছে, মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে পুরুষসঙ্গ লাভের কামনার উত্তাপ, তখন সেই বসুমতির সন্তান হয়েও এই বন্য যাযাবর শ্রেণীভুক্ত মানব মানবীর শরীরও বা কেমন করে কামের উত্তাপ বাঁচিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে! তাই শঙ্কর, কালী, জগন্নাথ, সিরাজ ভরপেট হাড়িয়া গিলে, লক্ষ্মী, বাসন্তী, রেজিনাদের হাঁড়িয়া গিলিয়ে চারপাই ছেড়ে চলে গেছে পিঠের টিলাগুলির আড়ালে। শরীর থেকে তাপ মোচনের যজ্ঞ শুরু হয়েছে ওখানে। অথচ একই চারপাইয়ের ওপর বিশ্বের কামনা বুকে নিয়ে উত্তরা বসে আছে তারই দায়িত্ব নেওয়া এক পুরুষের সঙ্গে।

— মিস্ত্রি! নিঃশ্বাসে তপ্তশ্বাস ছেড়ে নিচু গলায় ডাকল উত্তরা।

— বল্? সাড়া দিল দিবাকর।

— দিন যে অনেক গেল। কবে ঘর তুইলবে মিস্ত্রি? এইভাবে উপুসি থাইকতে যে পারি না।

— গইড়বোরে মেয়া। সময় হলি পরে ঠিক হইড়বো। দিবাকর বলে উঠল। সেই ঘরের টানেই তো মাঝরাতে মাঠের উপর বসে আছিরে মেয়ে।

— সেই ঘর কি তুমি দেইখতে পাও মিস্ত্রি?

— পাইরে। স্পষ্ট দেখতে পাই।

— কেমন দেখ সেই ঘর?

— ঘরের চার দেওয়াল সাদা মার্বেল পাথরে গড়া। ঘরের মেঝে থিক্যে ছাদ— তাও সাদা মার্বেল পাথরের। সব আমি নিজের হাতে গড়ে তইলব। তুই যোগান দিবি।

—ছাদও মার্বেল পাথরের?

উত্তরার সংশয় কাটে না। পুনরায় জিজ্ঞেস করে— অতবড় মার্বেল পাথরের চাঙড় পাবে কোথায় মিস্ত্রি? টুকরা টুকরা মার্বেল পাথর জোড়া দিয়ে ছাদ বানালে যে সেই পাথর ধসে পইড়বে।

— পড়বে না রে মেয়া। পইড়বে না। দিবাকর আশ্বস্ত করে বলল— মার্বেল পাথর জোড়া দিবার জন্য যে আমি একটা ইসপেশাল মশলা বানাইছি। সেই সুলতান-বাদশাহদের কালের রাজমিস্ত্রিরা ওই মশলা দিয়ে কত বড় বড় মার্বেল জোড়া দিয়ে মস্ত মস্ত ছাদ বানাইছিল। জানিস তো! একেবারে সেই মশলা।

উত্তরার গলা বলে যায়। একটু আগেও তার সর্বাঙ্গ জুড়ে যে পুরুষসঙ্গ লাভের কামনা ভূপৃষ্ঠের গ্র্যানাইট পাথরের মতো তপ্ত হয়ে তাকেই পুড়িয়ে খাওয়ার উপক্রম করেছিল, প্রতিটি শ্বাসের সঙ্গে নাকের পাটা ফুলিয়ে লু' বাতাসের মতো ঝরে পড়ছিল, সেই শরীর এখন রীতিমতো শীতল হয়ে উঠেছে। উত্তরাও যে তখন অন্ধকার মাঠের শেষ সীমানায় মিশকালো দিকচক্রে দেখতে পেতে শুরু করেছিল দিবাকরের তৈরি এক অলৌকিক ঘর। ঘরের চারদিকের চার দেওয়াল মার্বেল পাথর দিয়ে গাঁথা। দেওয়ালের মাঝখানে গবাক্ষ। গবাক্ষের চার সীমানা চাঁদি-পান্নার ডিজাইনে ঘেরা। ঘরের মেঝেয় সাদা মার্বেলের ওপর হরেক বর্ণের মণি-মুক্তোর আলপনা। আর ছাদ— একটার পর একটা সাদা মার্বেলের স্ল্যাবকে দিবাকরের আবিষ্কৃত মশলা দিয়ে জোড়া দিয়ে তৈরি।

এইভাবে কোনও ঘর কেউ কোনওদিন নির্মাণ করেছে কিনা, নির্মাণ-বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক পদ্ধতিও এমন ঘরের অনুমোদন দেয় কিনা জানে না উত্তরা। এমনকি উত্তরা একথাও জানে না যে দিবাকরও এমন কোনও ঘর নির্মাণের প্রযুক্তি আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা। তবু উত্তরার এই ঘরটাকে কল্পনা করতে ভীষণ ভালো লাগছিল। কত শতাব্দী আগে তাদেরই পূর্বপুরুষরা নিজেদের জীর্ণ কুটীর ছেড়ে তাড়াখাওয়া জন্তুর মতো বেরিয়ে পড়েছিল সভ্যতার অগ্রগতির জন্য নদীবক্ষে ড্যাম নির্মাণের জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়ার উদ্দেশে। পালিয়েছিল মূল্যবান ধাতু নিষ্কাষণের জন্য খনি স্থাপনের পরিসর করে দেওয়ার জন্য। উচ্ছেদ হয়েছিল ধাতুর আকরিক সম্পদ আহরণের প্রয়োজনে জায়গা করে দেওয়ার জন্য। এখন দিবাকরও ক্লান্ত। উত্তরাও ক্লান্ত। যাযাবর জীবনের ছেদ ঘটানোর জন্য কল্পনাতেও হলেও এমন একটা ঘর নির্মাণ করে মনে মনে। ▯

Telegram :LIBRAJUT
e-mail :
cil@ho.champdany.co.in
Web : www.jute-world.com

Phone : 2237-7880 to 85
2225-1050/7924/8150
Fax : 91 (33) 2225-0221
91 (33) 2236-3754

Libra Exporters Ltd.

Manufacturers, Exporters, Importers & Commission Agents

Works :- P.O. Choudwar,
Dist. Cuttack, Odisha - 754-025
Ph (0671) 2394304, 2394356,
2394267

REGD. Off.
33, C. R. Avenue
8th Floor
Kolkata - 700 012

ADMN. Off.
G.P.O Box 2539,
25, Princep Street,
Kolkata - 700 072

আন্দামান দর্শন

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ

সেলুলার জেলে বীর সাভাকরকে এভাবেই কোমরে ও পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। সেই ছবির পাদদেশে বসে আছেন লেখক ও সোমেন দাস।

ভ্রমণ কাহিনী লিখতে আমার অনভ্যাস এবং বিশেষ অনীহা। যেখানেই বেড়াতে গিয়েছি, দু-চোখ ভরে তার সৌন্দর্য বৈশিষ্ট্য উপভোগ করেছি। মনে গেঁথে রেখেছি; কিন্তু ফিরে এসে ইনিয়ে-বিনিয়ে ফেনিয়ে তার বৃত্তান্ত পত্রস্থ করা আমার ধৈর্যে কুলায়নি। আন্দামানে আমি ভ্রমণে যাইনি, গিয়েছি দর্শনে। তাই এই রচনা ভ্রমণের মনোহারী বর্ণনা না হয়ে হয়েছে দর্শনের নীরস লিপিমাত্র। — লেখক

।। ১।।

শৈশবকাল থেকেই জলের প্রতি ছিল আমার প্রবল আকর্ষণ। বছরের প্রায় ছ'মাস জলকাদা বেষ্টিত থাকতাম আমরা। বাড়ির উঠানে, ঘরের চালে, নৌকার ছইয়ের ওপর, ধান-পাট ক্ষেতে, খালেবিলে, পুকুর-দিঘীর বুকে, নারকেল-সুপারী গাছের মাথায় অঝোর ধারায় বৃষ্টিপাতের বিভিন্ন রূপ ও শব্দে কানে কখনও নূপুরনিক্কনের, কখনও বা জলতরঙ্গের ধ্বনি বাজত। ভোরে চোখ মেলতেই চোখে পড়ত জল-জমি-জঙ্গল। জল ঠেঙিয়ে কাকভেজা হয়ে খালিপদে স্কুলে ঢুকেও ক্লাসরুমের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই জল-জমি ও ফল-পাকুড়ের বাগানে দৃষ্টি নিবদ্ধ হতো। এক কথায়, আমরা ছিলাম জলের সহচর-জলচর না হলেও উভচর তো বটেই। অথচ সাঁতার শিখতে আমার লেগে গেল অনেকদিন। আমার সমবয়সীরা যে বয়সে জলে জোঁকের মতো কিলবিল করত, আমি ঈর্ষাকাতর চোখে তাদের দিকে

তাকিয়ে থাকতাম। অবশেষে বুকের নীচে নারকেল জোড়া বেঁধে জলে নামিয়ে মা আমাকে সাঁতার শেখান।

ঘরে ছিল একখানা অতি পুরনো ভূচিত্রাবলী। তার মধ্যে ভূমণ্ডলের প্রাকৃতিক বা নৈসর্গিক রূপ, যেমন— নদনদী- সাগর-মহাসাগর, মরুভূমি-বন-বেলাভূমি-মালভূমি, পর্বত-আগ্নেয়গিরি-দ্বীপ-বদ্বীপ-হ্রদ-প্রণালী-যোজক-অন্তরীপ-লেগুন-অ্যাটল ইত্যাদি নানারঙে রঞ্জিত থাকাতে সেটি খুবই আকর্ষণীয় ছিল এবং শিশুমনকে এক সুদূর কল্পরাজ্যে টেনে নিয়ে যেত। তার মধ্যে অসীম সাগর-মহাসাগরের মাঝে বিন্দু বিন্দু দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জের উপর আঙ্গুল রেখে আমি ভাবতাম, ওই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকলে, আর চারদিক থেকে বিরাট বিরাট ঢেউ এসে আছড়ে পড়লে কেমন মজা হতো! কিন্তু ওই ক্ষুদ্র বিন্দুটি যে কয়েকশ মাইল বিস্তৃত কঠিন ভূমিখণ্ড, তা বোঝার মতো জ্ঞানবুদ্ধি তখনও হয়নি। বিশেষ করে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ অন্তিমপ্রান্তে Pygmalion Point -এ (গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তির নামাঙ্কিত পরবর্তীকালে ইন্দিরা পয়েন্ট নামান্তরিত) ভারত মহাসাগরের অনন্ত নীলাম্বুরাশির মাঝে দাঁড়িয়ে সৌন্দর্য উপভোগের বালসুলভ ইচ্ছা জাগত।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপের প্রতি আকর্ষণ আমার বেড়েছে বই কমেনি। খুনখারাপি ডাকাতির মতো জঘন্য অপরাধে দণ্ডিতদের যাবজ্জীবন কারাবাসের জন্য দ্বীপান্তর বা কালাপানি পারের বাসস্থান রূপে নির্ধারিত আন্দামান সম্পর্কে অজানা কৌতূহল তো ছিলই, শেষে বৈপ্লবিক আন্দোলনে জড়িত দেশসেবকদেরও দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করে আন্দামানে নির্বাসন ও অবর্ণনীয় অত্যাচারের কাহিনী পড়ে মনুষ্যবাসের অযোগ্য ওই দ্বীপপুঞ্জের মাটি ও মানুষের পরিচয় জানার বাসনা বেড়েছে বই কমেনি।

অবশেষে এলো ভারতবর্ষের ইতিহাসের সেই ঘোরতর রক্তাক্ত ও কালো দিনটি— ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ সাল। ধর্মে হিন্দু হবার অপরাধে মাতৃভূমির সঙ্গে নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন করে, নোয়াখালীর শান্ত সুনিবিড় গৃহকোণ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি দিলাম। আক্ষরিক পুনর্বসতি পেলেও মানসিক বাস্তুহারা ভাব আজও কাটেনি, কোনও দিন কাটবেও না।

আমার মতো লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারার মধ্যে কিছু কিছু লোককে পুনর্বাসন দেবার জন্য যখন দণ্ডকারণ্য ও আন্দামানে পাঠাবার সিদ্ধান্ত হল, তখন ক্ষোভে দুঃখে একজন উদ্বাস্তু কবিয়াল গেয়েছিলেন—

''মোদের সোনার বাংলা জংলা হল,
কোন্ বিধাতার কোন বিধানে।
তাইতে হিন্দু-মুসলিম হয়েছি ভাগ,
শয়তানের ডাক শুনে কানে।।
স্বাধীন হয়ে শান্তি কত,
কাঙালী বাঙালী যত,
হিন্দুস্থানে সমাগত, পড়িয়ে বিষম নিদানে।
শরণার্থী করতে পোষণ,
নাম করিয়ে পুনর্বাসন,
চিরতরে দেয় নির্বাসন—
দণ্ডকবনে আর আন্দামানে।।
কোন্ বিধাতার কোন বিধানে।।''

(নকুলেশ্বর সরকার - ঝালোকাটি, বরিশাল)

সেদিন এই গান শুনে সর্বহারা রিফিউজীরা বিনা খুনে শাস্তি স্বরূপ দ্বীপান্তরে নির্বাসিত হচ্ছে বলে, চোখের জল ফেলতে ফেলতে আন্দামানগামী জাহাজে উঠেছিল। তাদের মধ্যে আমার দু'একজন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ও ছিলেন।

।। ২।।

ঘরের টান যখন কেটে গেছে, মনে তখন দূরের টান ধরেছে। দেশ ভ্রমণের বাতিকে ধরেছে আমাকে। ভাগ্যগুণে সুযোগও জুটেছিল। বাটানগরবাসী এবং শিবপুর দীনবন্ধু কলেজের প্রয়াত অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেনগুপ্তর মাধ্যমে অধ্যক্ষ শ্রীকালাচাঁদ সাহার সঙ্গে যোগাযোগে উত্তরে হিমাচল থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী ও পশ্চিমে সোমনাথ-দ্বারকা থেকে পূর্বে অসম, অরুণাচল পর্যন্ত দেশের বৃহদংশের তীর্থস্থান এবং ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক গুরুত্বপূর্ণ ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যখ্যাত স্থানগুলি ভ্রমণের সুযোগ ঘটেছে। ভ্রমণসঙ্গী হিসাবে আরও পেয়েছিলাম রত্নেশ্বর বর্মন, বকুল ঠাকুর, অমল গুহ ও প্রয়াত নিরঞ্জন ঘোষকে। এই বিস্তৃত ভ্রমণ তালিকা থেকে বাদ পড়েছে কাশ্মীর। কারণ, যারা ভূ-স্বর্গকে ভূ-নরকে পরিণত করেছে, বাঙালীর পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে খুন করেছে, সেই নরক দর্শন করিনি বলে আমার কোনও আক্ষেপ নেই। একবার তাদের জাতভাইদের হাতে স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমির নরকে রূপান্তরিত দশা দেখার পর, পুনরায় নরক দর্শনে প্রবৃত্তি হয়নি। কিন্তু অতৃপ্ত রয়ে গেছে আবাল্য পোষিত আন্দামান দর্শনের আকাঙ্ক্ষা। লোকে আন্দামান বেড়াতে যায়, ফিরে এসে গল্প করে; সেসব শুনি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলি। কিন্তু তাদের পাঁচ সাত দিনের সফরকাহিনী ও ফাইভ স্টার হোটেলের খানাপিনার গল্পে আমি কোনও তৃপ্তি পেতাম না।

অবশেষে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। ইতিমধ্যে বয়সও সত্তরের কোঠা ছুঁই ছুঁই। 'স্বস্তিকা' পত্রিকায় কিঞ্চিৎ লেখালেখি এবং ২৬ নং বিধান সরণিতে জাতীয়তাবাদী শিক্ষক মণ্ডলীর সাপ্তাহিক বৈঠকে যোগাযোগের সুবাদে পরিচয় ঘটে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কর্মকর্তা শক্তিপদ ঠাকুরের সঙ্গে। তিনি বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, আন্দামান শাখার আঞ্চলিক সম্পাদক। কল্যাণ আশ্রমের কাজকর্ম পরিদর্শন ও তদারকের জন্য

তাঁকে মাঝেমাঝেই আন্দামানে যেতে হয়। কথায় কথায় তার কাছে আন্দামান দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করে ফেলি। তিনি একাধিকবার বলেছেন, চলুন একবার বেড়িয়ে আসবেন আমার সঙ্গে গিয়ে। কিন্তু আমার আর সময় হয় না। হঠাৎ ২০০১ সালের ১লা ডিসেম্বর শক্তিবাবু জানালেন, তিনি ৪ঠা ডিসেম্বর আন্দামান যাচ্ছেন। ইচ্ছা হলে তার সঙ্গী হতে পারি। আমার যেন মনে হল, এই শেষ সুযোগ। এ সুযোগ ছাড়া নয় কিছুতেই। বিশেষত আমরা তো কন্‌ডাকটেড ট্যুরে যাচ্ছি না, একজন জবরদস্ত অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে যাওয়া হচ্ছে। বাটানগর থেকে 'স্বস্তিকা' অফিসে আসা-যাওয়ার সঙ্গী শিক্ষক বন্ধু শ্রী সোমেন দাসও সঙ্গী হতে রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু হাতে মাত্র দু'দিন সময়। টিকিট পাওয়া দুরুহ ব্যাপার। আমি ও সোমেনবাবু ফটো ও টিকিটের দাম শক্তিবাবুর হাতে দিয়ে দুর্গা নাম জপতে থাকি।

৩ ডিসেম্বর দুপুর বেলা খবর পাই যে, টিকিট হয়ে গেছে এবং শক্তিবাবুর নির্দেশ মতো আমি ও সোমেনবাবু ৪ ডিসেম্বর বিকালে খিদিরপুর ডকে হাজির হই। শক্তিবাবু এবং কল্যাণ আশ্রমের শিলিগুড়ি শাখার পূর্ণকালীন কার্যকর্তা মিলন ব্যানার্জীও এসে জোটেন। যথারীতি এম ভি নিকোবর জাহাজে ওঠা গেল, নিয়মমাফিক মেডিকেল চেক-আপ সেরে। ছ'জনের কেবিনে আমরা চারজন এবং অপর দুই যাত্রী। রাত ৯টা পর্যন্ত জাহাজ জেটিতে দাঁড়িয়ে রইল মালপত্র এবং প্রায় দেড় হাজার লোকের তিন-চার দিনের রসদাদি তোলার জন্য। তারপর জাহাজ নড়েচড়ে ওঠে; আমাদের হৃদয়ও আনন্দে নেচে ওঠে— যাক, শেষ পর্যন্ত আন্দামানে যাচ্ছি। কিন্তু শুরুতেই হরিষে বিষাদ। জাহাজ গড়াতে গড়াতে জেটি থেকে বেরিয়ে গঙ্গার বুকে এসেই বসে পড়ে। জানা গেল, তার তলপেট গঙ্গার পলিতে সেঁটে গেছে। পরবর্তী জোয়ার না আসা পর্যন্ত গাত্রোত্থানের আশা নেই।

পাঁচ ডিসেম্বর সকাল ন'টায় জোয়ার এলে একটা ভারী লঞ্চ এসে জাহাজের মুখ পেছন থেকে সামনের দিকে ঠেলে সোজা করে দিলে, জাহাজ চলতে থাকে— পাইলটের নির্দেশিত পথে। অর্থাৎ দীর্ঘ বারো ঘন্টা আমরা খিদিরপুরেই জাহাজে আটকে রইলাম। পরে ধীরে ধীরে বাটানগর-নঙ্গী-বজবজ-বাউড়িয়া-বিড়লাপুর-উলুবেড়িয়া, অছিপুর-ফলতা-নূরপুর-ডায়মন্ড হারবার-হলদিয়া ডাইনে-বাঁয়ে রেখে বিকাল পাঁচটায় Sand head point -এ জাহাজ স্থির হয়ে দাঁড়াল। খিদিরপুর থেকে আগত পাইলট জাহাজ ছেড়ে লঞ্চে করে কাকদ্বীপ কি নামখানায় চলে গেলেন— জাহাজের ভার ক্যাপ্টেনের হাতে দিয়ে। রাত দশটা নাগাদ মৃদুমন্দ দুলুনি থেকে বোঝা গেল, জাহাজ নদীর এক্তিয়ার অতিক্রম করে সমুদ্রে পড়েছে; দক্ষিণ মুখে ১৪ নটিক্যাল বা ২৬ কে এম বেগে ছুটছে।

।। ৩।।

ছুটছে তো ছুটছেই। দিগন্তবিস্তারী জলরাশি অতিক্রম করে একখানা ভাসমান জনপদ যেন। কি নেই তার মধ্যে। থাকা-খাওয়া শোওয়া বেড়ানো খেলাধূলা গান-বাজনা, সিনেমা-টিভি দেখা সব

কল্যাণ আশ্রমের ছাত্রাবাসের এক কার্যক্রমে লেখক (বসে)। বক্তব্য রাখছেন শক্তিপদ ঠাকুর।

ব্যবস্থা রয়েছে। একবেলা নিরামিষ খেয়েই বুঝলাম ব্যাপার সুবিধার নয়, সুতরাং Full Voyage Meal -এর কুপন কাটা হল ৩৪০ টাকায়। তার বিনিময়ে পেলাম—

সকাল ৬.৩০ : চা-বিস্কুট (কেবিনে)। ৮.৩০ : ব্রেকফাস্ট— ওমলেট, সুজির পোলাও, আলুভাজি, কর্ণফ্লেক, সম্বরা, পাউরুটি, ফলের রস, মাখন, জেলি।

১২.৩০ : ফ্রায়েড রাইস, ফ্রায়েড চিকেন, বেগুনের তরকারি, সালাড, ডাল, দই, পাঁপড়, আপেল, চা।

বিকাল ৪.৩০— চা, বিস্কুট।

সন্ধ্যা ৬.৩০ : আটার রুটি, মাছ ভাজা, মাটন কারি, পেঁপের তরকারি, পায়েস।

নিরামিষ থেকে আমিষে এলাম বটে, কিন্তু এই রাক্ষুসে খাবার আমার দুর্বল পাকযন্ত্রের পক্ষে গ্রহণ করা কষ্টকর হয়ে উঠল। সুতরাং 'অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' নীতি মেনে অর্ধেক খেয়েই উঠে পড়তাম। বেশিরভাগ মাংসই পাচার করে দিতাম সোমেনবাবুর পাতে।

With Best Compliments From :-

An ISO 9001 : 2008
certified Company

SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

FOR ANY TYPE OF PILE FOUNDATION WORK
Cast-in-Situ Driven, Cast-in-Situ Bored, Precast Driven, Precast

AND
All Types of Engineering and Construction Works for Civil, Structural, Marine, Tankages, Piping Equipment Erection In

Regd. Office
"Simplex House"
27, Shakespeare Sarani, Kolkata-17
Phone (033) 2301 1600
Fax : (033) 2283 5964/65/66
E-mail : simplexkolkata@simplexinfra.net
Web. : www.simplexinfrastructures.com

Adm. Office
12/1, Nelllie Sengupta Sarani
Kolkata - 700 087
Phone (033) 2252 8371/8373/8374
Fax : (033) 2252 7595

BRANCHES

NEW DELHI MUMBAI CHENNAI

OVERSEAS BRANCHES

QATAR DUBAI BAHRAIN

খাবার কথা যাক। আমি সকাল-দুপুর-বিকাল-রাত জাহাজের ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পেছনে দাঁড়িয়ে বা বসে, সমুদ্রের বিভিন্ন রূপ, জাহাজের জল কেটে চলা, তরঙ্গের বিচিত্র ছন্দ, মাছেদের আনন্দনৃত্য দেখতাম দু'চোখ ভরে। জলের রং নেই; যে পাত্রে রাখা হয় সে রঙই ধরে জানতাম। সমুদ্রের জল দেখতাম কোথাও নীল, কোথাও সবুজ, কোথাও বা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। এই কৃষ্ণবর্ণ থেকেই বোধহয় কালাপানি কথার উৎপত্তি। একজন বলল, যেখানে জলের রঙ কালো সেখানেই সমুদ্রের গভীরতা সবচেয়ে বেশি।

তিনদিনের দিন (৭/১২) সন্ধ্যাবেলা প্রথম লোকালয়ের সন্ধান জানা গেল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সর্বোত্তর সীমান্ত অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের নিকটতম আন্দামান ভূমি ডিগলিপুরের লাইট হাউসের আলোর সঙ্কেত দেখে। তারপর থেকে সারা রাত উত্তর আন্দামানের তটভূমি ডাইনে রেখে জাহাজ দ্রুতবেগে দক্ষিণ মুখে পোর্টব্লেয়ারের দিকে ছুটেছে— যেন তার নষ্ট-সময় মেক-আপ করতে। রাত ২.৩০ মিনিটেও কেবিনের ফোকর দিয়ে দেখি জাহাজের অবিরাম গতিতে কোনও ছেদ বা বিরাম নেই। ভোর ৪টায় ঘুম ভাঙলে দেখি, জাহাজ পোর্টব্লেয়ার জেটির অদূরে পাইলট পয়েন্টে আছে। নিশ্চল জাহাজের গায়ে উঁচু উঁচু ঢেউ ছুটে এসে যেন চল চল বলে চাপড় মারছে। এবং 'আমার হাল ধরে নিয়ে চলো সখা, আমি যে পথ জানি না' বলে পাইলটের অপেক্ষা করছে।

প্রায় ৪ ঘন্টা পাইলট পয়েন্টে অপেক্ষার পর ৮ ডিসেম্বর সকাল ৮ টা নাগাদ পাইলট এসে দড়ির মই বেয়ে জাহাজে উঠে ক্যাপ্টেনের হাত থেকে জাহাজের দায়িত্ব নিলে জাহাজ হেলতে দুলতে Haddo জেটিতে ঢুকে নোঙ্গর ফেলল। যাত্রীরা ধীরে ধীরে নেমে এলো। আমরা তিনদিন চার রাত পর জল থেকে স্থলে পা রাখলাম আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারে।

।। ৪।।

আমি, শক্তিবাবু, সোমেনবাবু ও মিলনবাবু জাহাজ থেকে নামতেই দু'জন কল্যাণ আশ্রমবাসী যুবক এগিয়ে এসে হাত থেকে ব্যাগ বোঝা কেড়ে নিয়ে একটা জীপে তুলে দিল— তার আগে প্রণামটি সেরে নিতে ভুলল না। আমরা শক্তিবাবুর বন্ধু যে! সাড়ে আটটায় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের প্রধান দপ্তরে প্রবেশ— গান্ধী পার্কের পেছনে মুরুগণ মন্দিরের পাশে।

কল্যাণ আশ্রম ব্যাপারটা কি একটু ভেঙ্গে বলা দরকার। বিশ্বখ্যাত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তথা আর এস এসের সেবামূলক বিভিন্ন কর্মযজ্ঞের অন্যতম একটি শাখা হল 'বনবাসী কল্যাণ আশ্রম'। অবহেলিত অবজ্ঞাত বনবাসীদের মধ্যে জাতীয়তা ও ভারতীয়ত্ববোধ জাগ্রত করা, খৃস্টান মিশনারীদের আগ্রাসী অভিযান এবং খৃস্টানী করার কুপ্রচেষ্টা থেকে আদিবাসীদের নিজস্ব ধর্ম সংস্কৃতি রক্ষা করার প্রেরণা জাগানো, তাদের সন্তান-সন্ততিদের জাতীয় ভাবধারার মূলস্রোত থেকে বিচ্যুত করার চক্রান্ত ব্যর্থ করতে শিশুকাল থেকেই 'জয়রাম— শ্রীরাম' মন্ত্রে দীক্ষিত ও অনুরক্ত করে রাখার কাজেই কল্যাণ আশ্রমের ত্যাগী কর্মীরা নিয়োজিত।

আমরা কল্যাণ আশ্রমে উঠেছি জেনে কেউ কেউ এই আশ্রমের ঠিকানা এবং গুরুদেবের নাম জানতে চায়। আমি শক্তি ঠাকুরের নাম চালিয়ে দিই। নামের সঙ্গে ঠাকুর থাকাতে তারা আরও আকৃষ্ট হয়। জানি না তারা কেউ শক্তিবাবু থেকে দীক্ষা নিয়েছে কিনা!

আশ্রমে প্রবেশ করতেই আশ্রম পরিচালক তথা আন্দামান-নিকোবর প্রদেশ সংগঠন সম্পাদক বিজয় মহান্তী স্বাগত জানালেন। আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ এসে প্রণাম করে। হাতমুখ ধুয়ে সবার সঙ্গে ধোসা সহযোগে জলযোগান্তে তিনখানা তক্তাপোষে পাতা শয্যায় দেহ এলিয়ে দিই। দুপুরে স্নানান্তে আবাসিকদের সঙ্গেই পংক্তি ভোজ— মোটা চালের ভাত, হাল্কা ডাল ও এক পাঁচমিশেলি ঘ্যাঁট তরকারি। অর্থাৎ 'ভোজনং যেমন তেমনং, শয়নং তক্তপোষ্যপরি।' তখন জাহাজের ফেলে দেওয়া খাবারগুলির কথা মনে পড়ল। কিন্তু কচিকাঁচাদের সঙ্গে বসে অভিন্ন খাবারের স্বাদ আলাদা।

আহারান্তে বিশ্রাম করতে করতে আগামী ক'দিনের প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলা হল। শক্তিবাবুই দিশা দিলেন। ট্যুরিস্ট স্পট দেখার সঙ্গে সঙ্গে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন, বিভিন্ন অঞ্চলে সঙ্ঘ কর্মী ও অনুরাগীদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং ভাববিনিময়ই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথম দিনই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে বেরিয়ে পড়লাম বিপ্লবতীর্থ সেলুলার জেল দর্শনে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সমগ্র আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ শাসনতান্ত্রিকভাবে মোটামুটি চারটি অঞ্চলে বিভক্ত— উত্তর আন্দামান, মধ্য আন্দামান ও দক্ষিণ আন্দামান এবং লিটল আন্দামান। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আলাদা প্রশাসন। রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ার দক্ষিণ আন্দামানে অবস্থিত। আর এই পোর্ট ব্লেয়ার শহরেই অবস্থিত বিখ্যাত ও কুখ্যাত সেলুলার জেল— বিশ্বে যার সঙ্গে তুলনীয় দ্বিতীয়টি নেই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত আন্দামানের ইতিহাস ও সেলুলার জেল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

একদা কুখ্যাত খুনী ডাকাত দস্যু ও লুঠেরাদের নির্বাসনভূমিই প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সৈনিকদের নির্বাসনক্ষেত্র রূপে নির্দিষ্ট হয়। তখনও সেলুলার জেল তৈরি হয়নি। তারপর পাকাপাকি জেলখানা তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনজনিত বৈপ্লবিক কাজকর্মে জড়িতদেরও দ্বীপান্তরবাসের হুকুম হলে ১৯০৮ সালে সেলুলার জেলে তাদের আবদ্ধ করে রাখা হয়। অন্যদিকে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, সংযুক্ত প্রদেশে (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) বৈপ্লবিক

কাজকর্মে জড়িতদেরও সেলুলার জেলে পোরা হতে থাকে। ১৯৩১ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়করাও শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে আন্দামানে প্রেরিত হন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা মূল ভূখন্ডে ফিরে আসার দাবিতে অনশন শুরু করলে, গান্ধীজীর মধ্যস্থতায় সশস্ত্র আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করে অহিংস পন্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দিলে, সরকার তাদের মূল ভূখণ্ডের জেলে নিয়ে আসে। তারপর সেলুলার জেলে আর কোনও রাজনৈতিক বন্দী পাঠায়নি। বাংলার বিপ্লববাদের এই যে অপঘাত মৃত্যু ঘটল, আট দশ বছর পর বিধর্মী গুণ্ডাদের হাতে মা-বোনের ইজ্জতহানি ও ধর্ম নষ্ট হলেও হিন্দু বিপ্লবীদের হাতে আর পিস্তল গর্জে ওঠেনি। তারা লাখে লাখে বাস্তুচ্যুত হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসে।

।। ৫।।

তাদের পুনর্বাসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তুকে আন্দামানে পুনর্বাসন দেবার ব্যবস্থা হয় ভারত সরকারের সহায়তায়। কিন্তু তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির প্রবল বাধায় সে প্রকল্প হোঁচট খায়— কমিউনিস্টরা 'লাঠি খাব, গুলি খাব, বাংলা ছেড়ে যাব না' শ্লোগান দিয়ে উদ্বাস্তুদের জাহাজে উঠতে বাধা দিয়েছে, জাহাজ থেকে টেনে নামিয়েছে। তারা তাদের ভগবৎ প্রদত্ত 'রেডিমেড ভোটব্যাঙ্ক' কোনওমতেই হারাতে রাজি ছিল না। সেই ফাঁকে দক্ষিণ ভারতীয়রা দলে দলে আন্দামানে ঢুকে পড়ে ও জীবিকার লড়াইয়ে অগ্রাধিকার লাভ করে এগিয়ে যায়। পরে বাঙালী রিফিউজীরা গিয়ে দেখে কাজকারবার ও চাকরি-বাকরির বেশির ভাগই দক্ষিণীদের দখলে। সেই ক্ষোভে বাঙালী রিফিউজীরা কমিউনিস্ট পার্টিকে আন্দামানে লাল পতাকা উড়াতে দেয়নি। সেখানকার রাজনীতি আবর্তিত হচ্ছে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে।

পূর্ববঙ্গে পদ্মা-মেঘনার মিষ্টিজলে বিধৌত সোনা ফলা মাটি ফেলে এই মনুষ্যবসতিহীন সাগরের লোনা জলে ঘেরা বন জঙ্গলে টিলা-নালায় বাস করতে বাধ্য হলেও, তারা যে তাদের শিকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে মুছে ফেলতে পারেনি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় নতুন নতুন গড়ে ওঠা বসতি অঞ্চলগুলির নামকরণের মধ্যে। আন্দামানে পদক্ষেপের পর বিভিন্ন দ্বীপের অভ্যন্তরে যত ঘুরেছি তত চোখে পড়েছে পুনর্বাসন প্রকল্পের বাহারী নামাবলী। যেমন— মধুপুর, সুভাষগ্রাম, কালীঘাট, মায়াবন্দর, হরিনগর, বকুলতলা, উর্মিলাপুর, কদমতলা, নিম্বুতলা, গুপ্তপাড়া, রামকৃষ্ণপুর, রাধানগর, লক্ষ্মীপুর, সীতানগর, কিশোরীনগর, নবগ্রাম, রামনগর, শ্যামনগর, স্বরাজগ্রাম, দেশবন্ধু, শিবপুর, কালীপুর, দুর্গাপুর, মোহনপুর, নিশ্চিন্তপুর, মধ্যমগ্রাম, জগন্নাথডেরা, বিবেকানন্দপুর, বাসন্তীপুর, উর্মিলানগর, শবরী, উত্তরা, কৌশল্যানগর, জয়পুর, কমলাপুর ইত্যাদি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, নেতাজী ও দেশবন্ধুর নামোল্লেখ থাকলেও ভ্রষ্টাচারী রাজনীতিকদের যারা তাদের এই দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী— বিশেষত গান্ধী-নেহরুদের নাম, একেবারে ত্যাগ করেছে। ভবিতব্য বোধহয় একেই বলে।

বাঙালী বসতিপূর্ণ এই জায়গাগুলির নাম পরপর পড়ে গেলে মনে হয় না কি যে, বাংলার একটি অঞ্চল তুলে এনে যেন আন্দামানে স্থাপন করেছে। শ্রুতিগোচর দূরত্বে সামুদ্রিক জলকল্লোলের পাশে সুপারি-নারকেল গাছ এবং কলা ও বাঁশঝাড়ে ঘেরা পূর্ববঙ্গীয় ধারায় তৈরি ঘর-বাড়ির প্রাঙ্গনে ধানের পারা ও তুলসীমঞ্চ। সঙ্গে গরুঘর ও ঢেঁকিঘর নিয়ে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। বিকাল হলে সেজেগুজে খোল-করতাল-হারমোনিয়াম নিয়ে দল বেঁধে কোনও বাড়িতে কীর্তন করতে যাওয়ার দৃশ্য দেখলে ফেলে আসা পূর্ববঙ্গের একটা খাঁটি গ্রাম্যদৃশ্য বলে ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক।

।। ৬।।

সেই ঐতিহাসিক সেলুলার জেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম; ভগ্নাবশিষ্ট জেলখানার বিভিন্ন অংশ খুঁটে খুঁটে দেখলাম। কিছু লিটারেচারও কিনলাম। জেলখানার প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে মনে পড়ল এর প্রতি ধূলিকণা ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনে কৃতসঙ্কল্প সন্তানদের স্বেদ অশ্রু ও রক্তেমিশ্রিত। প্রতি প্রস্তরখণ্ডে গাঁথা রয়েছে বর্বরোচিত দৈহিক অত্যাচারে আহত রক্তাক্ত নিহত বীর বন্দীদের ক্রন্দনরোল, প্রতিবাদী কণ্ঠের বজ্রনির্ঘোষ। লৌহশলাকা বেষ্টিত প্রতিটি কোটরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে সমস্ত মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত দেশসেবকদের হাহাকার ধ্বনি। তথাকথিত বৃটিশ শিক্ষা সভ্যতার শিরে, সেক্সপিয়র-মিলটন-টেনিসনদের মস্তকোপরি এটি এক কলঙ্ক মুকুট বিশেষ। নির্মম পাঠান প্রহরীদের নির্দয় নির্যাতনে কারো ঘটেছে অঙ্গহানি, কেউ বোধশক্তি হারিয়ে বোবা হয়ে গেছে, কেউ বা হয়েছে বদ্ধ উন্মাদ।

মনুষ্যশক্তিতে ভাঙা অসাধ্য এমন সুদৃঢ় লৌহশলাকা বেষ্টিত একতলা দোতলা তেতলার সেলগুলি ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে তেতলার শেষ প্রান্তে বীর সাভারকরের জন্য নির্দিষ্ট সেলটিতে এসে ঢুকলাম। তাঁর প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত দেখেই তা চিনতে অসুবিধা হয়নি। আমি ও সোমেনবাবু প্রণাম করে সে প্রতিমূর্তির সামনে বসলাম। শক্তিবাবু আমাদের ফটো তুললেন। এই সেলটি বীর সাভারকরের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল এই কারণে— যাতে তিনি বাইরের দিকে তাকালেই নীচতলায় ফাঁসি ঘরটির দিকে তার নজর পড়ে এবং তিনি ফাঁসিকাঠে ঝুলন্ত দেহগুলি স্বচক্ষে দেখতে পান। মানসিক নির্যাতনের এ এক চরম নিদর্শন।

সাতটি কলাম বিশিষ্ট এই জেলখানার তিনটি মাত্র অবশিষ্ট আছে, বাকী চারটি কলাম কিছুটা বোমার আঘাতে কিছুটা সরকারি

নির্দেশে ভেঙ্গে ফেলে সেখানে গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হাসপাতাল তৈরি হয়েছে। আমার মনে একটু খট্‌কা লাগল। সারা ভারত ছেড়ে পোর্ট ব্লেয়ারে সেলুলার জেল ভেঙ্গে সেখানে গোবিন্দ পন্থ কেন? মনে মনে ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখা গেল— এই সেই গোবিন্দবল্লভ নামক গাড়োয়ালটিই সুভাষচন্দ্র বসুকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়নের প্রস্তাব ওয়ার্কিং কমিটিতে তুলেছিল এবং এই সেই গোবিন্দবল্লভ যে কংগ্রেস কমিটিতে দেশভাগের অপ্রিয় ও আত্মঘাতী প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করেছিল— অবশ্য গান্ধীজীর অনুমোদন ও সুপারিশেই। কংগ্রেসের এই দুটি সিদ্ধান্তেই ভবিষ্যতে লাভবান হয়েছিল জওহরলাল নেহরু। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের পেছনে লাগার পুরস্কার হিসাবেই হয়তো নেতাজীর অক্ষয় কীর্তি সেলুলার জেলের উপর প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলনের কৃতিত্বের অধিকারীর পেছনেও গোবিন্দবল্লভের নাম সেঁটে দিয়েছে।

আরও অবাক হবার বিষয়, পোর্ট ব্লেয়ারে গান্ধীজী ও গোবিন্দবল্লভ পন্থের নামে রাস্তা থাকলেও নেহরুর নামে কোনও রাস্তা নেই। নেহরু সারা দেশ ঢুঁড়ে বেড়ালেও নেতাজীর পদধূলিধন্য এবং বৃটিশ শাসনমুক্ত ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের অধিকারী প্রথম ভারতীয় ভূমিখণ্ডে কখনও পদার্পণ করেছেন বলে জানা যায় না। মাউন্টব্যাটেনের নির্দেশে নেহরু সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের স্মৃতিস্তম্ভে যেমন শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে যাননি, আন্দামানে গিয়ে নেতাজীর প্রতি তথাকার ভারতীয়দের বাঁধনহারা উচ্ছ্বাস ও শ্রদ্ধা ভালোবাসার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখা থেকেও তাকে বিরত থাকতে বলেছেন।

।। ৭।।

স্বাধীন আন্দামানের রাষ্ট্র প্রধান রূপে নেতাজী ১৯৪৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর বিমানযোগে পোর্ট ব্লেয়ারে এসে পৌঁছন। ১৯৪১ সালে ২৬ জানুয়ারি কলকাতা থেকে অন্তর্ধানের পর এই তার প্রথম ভারতের মাটিতে পদার্পণ এবং স্বাধীন রাষ্ট্রনায়ক রূপে আন্দামানবাসী ভারতীয়দের দর্শন দান। তার পরবর্তী ইতিহাস নিম্নরূপ—

"The next day (29.12.43) Netaji visited the Cellular Jail. He was deeply moved to see it. The Japanese accompanied him and showed him a few convicted persons and few wings, but deliberately kept him away from the wing where so-called second spy case victims were kept.

On the last day of his visit (30.12.43) a public meeting was also arranged in the Gymkhana Maidan in which a large number of people came. Netaji came from Ross Island to Maidan in a ceremonious procession of a fleet of vehicles flanked by Japanese officers. On arrival Netaji went up the rostrum and unfurled the tricolour flag - the first one to be hoisted on the liberated Indian soil. Netaji renamed the Andaman and Nicobar Islands as 'Shaheed Dweep' (Martyr) and 'Swaraj Dweep' (Freedom). He explained the history of the freedom movement and formation of the Provisional Government. He attached great importance to Cellular Jail and the Andaman. In a press interview in early 1944 Netaji said,-

".... The liberation of the Andamans has symbolic significance, Because the Andamans was always used by the British as a prison of political prisoners... Like the Bastelle in Paris, which was liberated first in the French Revolution, setting free political prisoners the Andamans where our patriots suffered is the first to be liberated in India's fight for Independance. Part by part, Indian territory will be liberated but it is always the first plot of the land that holds the most significance". (B. R. Tamta, ex-Development Commissioner, A & N Islands)।

নেতাজীর জীবনের এই গৌরবময় অধ্যায় ছিল গান্ধী-নেহরুদের কাছে অসহনীয়। তা না হলে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গে নেহরু তার আত্মজীবনী লেখা শেষ করত না (১৯৪০)। তারপরেও নেহরু ২৪ বছর জীবিত ছিলেন, কিন্তু আত্মজীবনী শেষ করার তাগিদ অনুভব করেননি। কারণ, ১৯৪০ সালের পরের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করতে গেলেই তা নেতাজীর কীর্তিকাহিনী ও নিজেদের অপকীর্তির আক্ষরিক দলিল বলে গণ্য হতো যে! রাজনৈতিক ঈর্ষাপরায়ণতা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার চেয়ে কম বলবান নয়। একটা মানুষকে প্রাণে মারে, আরেকটা ইতিহাসকে হত্যা করে। কংগ্রেসীরা চিরকাল ইতিহাসকে হত্যা করেছে; তাই স্বাধীনতার খাঁটি ইতিহাস আজও রচিত হয়নি।

১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধী সরকারের পতনের পর জনতা দল পরিচালিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। জনতা সরকার সেলুলার জেলকে 'ন্যাশনাল মেমোরিয়াল' বলে ঘোষণা করে এবং প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই "dedicated the Memorial to the nation on 11th February, 1979"।

এই সেলুলার জেল প্রাঙ্গনে 'স্বতন্ত্র জ্যোতি'তে বীর সাভারকরের একটি অমূল্য বাণী সম্বলিত ফলক ছিল। কিন্তু

Mahavir Institute of Education & Research

Affiliated with I. C. S. E.

17/1, Canal Street, Kolkata - 700 014
Ph. No. 2265-5821/22

A School of UKG to Class - XII
(English Medium)
For Boys & Girls

সোনিয়া গান্ধীর কাপড়কাচা মন্ত্রী মণিশঙ্কর আয়ার (সি পি আইয়ের প্রাক্তন ছাত্র নেতা) সেই ফলক সরিয়ে গান্ধীজীর একটা বস্তাপচা বুলি সেস্থলে স্থাপন করেছে।

সেলুলার জেল ছাড়াও ক্যাম্পাসে রয়েছে নেতাজীর পূর্ণাঙ্গ জীবনী ভিত্তিক নেতাজী গ্যালারী। ট্যাবলোর মাধ্যমে কয়েদী নির্যাতনের বীভৎস পরিচয়দান ছাড়াও প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রদর্শিত হচ্ছে Sound and Light Programme—সেলুলার জেলের কয়েদীদের নির্মম জীবনকথা। সেখানে মুখ্যস্থান অধিকার করে রয়েছেন স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকরের অমিত তেজ ও অদম্য সংগ্রাম কাহিনী। এসব কি চোরাপথে গদি দখলকারী নেহরুদের কখনও সহ্য হয়! তাই নেহরুর ১৭ বছরব্যাপী শাসনকালের ভ্রমণতালিকা থেকে আন্দামান বাদ!

সেলুলার জেলে বন্দীদের এভাবেই ঘানি টানতে হোত।

আন্দামানে গেলে ভ্রমণার্থীরা পোর্ট ব্লেয়ার শহরের উপরে এবং সমুদ্রোপকূলে যেসব দর্শনীয় স্থান দেখেন এবং বোটে চড়ে নিকটবর্তী দ্বীপসমূহের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য উপভোগ করেন, তার বেশ কিছু আমরাও দর্শন করেছি। সেসবের বর্ণনা বহুকথিত এবং বাহুল্য বিধায় আমরা পোর্ট ব্লেয়ারের বাইরে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কেন্দ্রগুলি দর্শনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিই। বলাই বাহুল্য, ব্যবস্থাপক শক্তিবাবু, আমরা নিমিত্তমাত্র।

।। ৮।।

১০.১২.০১ তারিখে ভোর ৪টায় শয্যাত্যাগ করে ৬টার গভঃ বাসে জারওয়া ভূমি অতিক্রম করে দু'বার বাস সমেত নীলাম্বুর ও গান্ধীঘাট খেয়া পার হয়ে রামনগর বকুলতলা কন্যা ছাত্রাবাসে পৌঁছাই বেলা ১২.৩০ মিনিটে। এখান থেকেই মোটামুটি উদ্বাস্তু পুনর্বাসিত এলাকা শুরু। আশ্রমে পৌঁছে স্নান সেরেই খেতে বসি আশ্রমিকদের সঙ্গে। বিকালে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত আশ্রম কর্মীদের সভা বসে। শক্তিবাবু সুন্দরভাবে সংগঠন পরিচালনা ও অর্থ সংগ্রহের রীতিপদ্ধতি কর্মীদের কাছে বুঝিয়ে বলেন। কর্মীরাও তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা খোলাখুলিভাবে বলেন এবং পরামর্শ কামনা করেন। এসব স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নানারকম সমস্যা সম্পর্কে একটা সুন্দর অভিজ্ঞতা হল। চা-পান শেষে কদমতলায় মহাজনের বাড়ি যাই এবং সন্ধ্যারাতে অনেকখানি হেঁটে আশ্রমে ফিরে আসি।

১১.১২.০১— শরীর ভাল ঠেকছে না। গা ব্যথা, জ্বর জ্বর ভাব। তবু ৮টায় বকুলতলায় বিবেকানন্দ হাজরার বাড়ি যাই। জলখাবারের পর রঙ্গত কল্যাণ আশ্রম, স্কুল ও বিবেকানন্দ মিশন স্কুল পরিদর্শন করি। ছোটছোট ছাত্রছাত্রীরা গান গেয়ে নেচে আমাদের আপ্যায়ন করে। সবার সঙ্গে ফটো তুলে শ্রীহাজরার বাড়ি ফিরে আসি। খাবার পর বিশ্রাম। সন্ধ্যায় বাসন্তী মন্দিরগৃহে স্থানীয় বাঙালী ভদ্রলোকদের সঙ্গে বৈঠক। বৈঠক শেষে ঠাণ্ডার মধ্যে অনেকখানি রাস্তা হেঁটে ছাত্রাবাসে এসেই শয্যাগ্রহণ।

১২.১২.০১— ভোর সাড়ে চারটায় উঠে ৬টার বাস ধরে তিন ঘন্টা বাসজার্নির পর মায়াবন্দর পৌঁছাই। শক্তিবাবু আগেরদিন এসে বাসস্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করছিলেন। নিকটবর্তী পোকাডেরা হনুমান মন্দিরের পূজারী হরিহর রামও ছিলেন। সমুদ্রতীরে বন্দরের অবস্থান, চারপাশে উদ্বাস্তু বাঙালীর কাজকারবার, কথাবার্তা এবং তেমনি মায়া জাগানো মায়াবন্দর নামটি। টিফিন করে অটোতে পোকাডেরায় মন্দিরে পৌঁছাই। শরীরও হাল্কা। মাথা ধুয়ে পূজারীর ঘরে দ্বিপ্রাহরিক আহার ও বিশ্রাম। সমুদ্রতীরে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা। ২.৪৫ মিনিটে লঞ্চ ধরে দু'ঘন্টায় কালীঘাট পৌঁছাই। এ স্থান উত্তর আন্দামানের অংশ ডিগলিপুরের নিকটবর্তী।

ডিগলীপুরেই প্রথম বাঙালী উপনিবেশ স্থাপিত হয়। চারদিকে বাঙালীয়ানার ছাপ। অধুনা স্বনামখ্যাত স্বামী অসীমানন্দ প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির দর্শন। রাতে টিলার উপর অবস্থিত বি আর বাঘেলের বাড়িতে থাকা খাওয়া। সকালে দেখি চারদিকে পোষা হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

১৩.১২.০১— ভোরে উঠে কালপ্লং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প দেখতে যাওয়ার চেষ্টা। অত্যধিক ভাড়া চাওয়ায় ইচ্ছা বাতিল। ওদিকে সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় ডিগলিপুরে বাঙালী বসতি দেখতে যাওয়াও হল না। তারপর আরও ১০ মাইল গেলে এরিয়াল বে-তে সুদৃশ্য স্টীমার ঘাটও দেখা হল না। তবে ৪ কিমি দূরে কালারায় স্বামী অসীমানন্দ প্রতিষ্ঠিত মন্দির দেখতে যাই এবং আরও এগিয়ে যাবার বাসনা অপূর্ণ রেখে কালীঘাট জেটি বাজারে হোটেলে খেয়ে ১২.৩০ মিনিটের শেষ লঞ্চ ধরি। দু'ঘন্টা সমুদ্র পথ অতিক্রম করে ফের মায়াবন্দরে পৌঁছাই। সেখানে ফরেস্ট অফিসারের ঘরে ঢুকে টিভি-তে লোকসভায় সন্ত্রাসী আক্রমণের সংবাদ ও ছবি দেখি।

মন্দিরে ফিরে আসি এবং স্নান সেরে হাল্কা জলখাবারের ব্যবস্থা। লোকজন আসতে থাকে। দু'জন আই বি'র লোক আসে আমাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে। তারপর মন্দিরে কীর্তন। প্রার্থনা ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার পর খিচুড়ি খেয়ে শয্যা গ্রহণ। সারাদিন বড়ই টানাপোড়েনে কাটে।

১৪.১২.০১— ভোর সাড়ে তিনটায় উঠে ৫টার বাস ধরার প্রস্তুতি। অত রাতে গাড়ী না মেলায় সর্টকাট পথ ধরে গাড়ি ধরা ঠিক হয়। রাস্তা অনেক সংক্ষেপ। তবে মাঝে অন্তত ৫০০ গজ সামুদ্রিক নালায় কাদার নিচে ধারাল প্রস্তরখণ্ডের উপর দিয়ে ঘোর অন্ধকারে কাঁধে বোঝা নিয়ে ডালপালা ধরে পথ চলা যে কি ভয়ঙ্কর কষ্টদায়ক, বলে বোঝানো যাবে না— ওদিকে গাড়ি ফেল করার ভয়। এক মিনিট নষ্ট করার জো নেই। এভাবে ৫০ মিনিটের পথ ২০ মিনিটে আসা গেল। পাঁচটায় বাস এলে দুটো জেটি বাস সমেত পার হয়ে ৮ ঘন্টায় ২৪২ কিমি নিবিড় বন, সমুদ্রের তীর ও জনবসতির মাঝখান দিয়ে বেলা একটায় পোর্টব্লেয়ারে কল্যাণ আশ্রমে পৌঁছাই বিধ্বস্ত হয়ে।

।। ৯।।

১৫.১২.০১— রস আইল্যান্ড, চিড়িয়া টাপু ও স্টেট লাইব্রেরী দর্শন।

১৬.১২.০১— কারবাইনস্কোপ সমুদ্র সৈকতে স্নান সেরে স্থানীয় এডভোকেট মিঃ তুলসীলালের বাড়িতে ভুরিভোজ। ইনি সঙ্ঘ অনুরাগী এবং কল্যাণ আশ্রমের পৃষ্ঠপোষকও বটে। ইনি খাঁটি আন্দামানী বা লোক্যাল বর্ন। এর পূর্বপুরুষ কোনও অপরাধের শাস্তি হিসাবে আন্দামানে নির্বাসিত হন। মেয়াদ শেষ হলে আর মূল ভূখণ্ডে ফিরে যাননি— এখানেই কারামুক্ত কোনও মহিলার চোখ বাঁধা অবস্থায় পানি গ্রহণ করেন। 'সাদিপুর' নামক স্থানেই এসব বিয়ে অনুষ্ঠিত হতো। বর কনে কারও ধর্মের কোনও উল্লেখ থাকত না। এদের সন্তানসন্ততিরাই আন্দামানীজ বা লোক্যাল বর্ন বলে গণ্য হতো— এদের জাত-পাত-গোত্র-ধর্মের কোনও উল্লেখ কোথাও থাকে না।

এদিন সন্ধ্যায় বীর সাভারকরের নামাঙ্কিত এয়ারপোর্টের কাছে সঙ্ঘকর্মী দিলীপ ঘোষ ও দুলাল নস্করের আস্তানায় যাই। শিশু শিবির সম্পর্কে সমাগত ব্যক্তিদের আলোচনা শুনি। সভার পর দিলীপ-দুলালের রাঁধা খিচুড়ি খেয়ে আশ্রমে ফিরি।

১৭.১২.০১— আশ্রমেই অবস্থান। দুপুরে কল্যাণ আশ্রমের স্থানীয় সম্পাদক মিঃ মুকেশ গুপ্তার কোয়ার্টারে নিমন্ত্রণ সেরে আশ্রমে ফিরে লিটল আন্দামান দ্বীপে (সমুদ্রপথে ১২০ কিমি) যাবার আশা-নিরাশায় দুলি। সন্ধ্যায় ক'জন শিক্ষক-অধ্যাপক এলেন ইতিহাস সঙ্কলন সমিতি সম্পর্কে আলোচনা করতে— তেমন কোনও উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গেল না।

বিকালে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান (মুসলমান) কল্যাণ আশ্রম ছাত্রাবাস দর্শনে এলেন। তাকে আশ্রম ও স্কুল সম্পর্কীয় সব তথ্য জানানো হল। তিনি ছাত্রদের জন্য এক বস্তা চাল মঞ্জুর করে বিদায় হলেন। ছোট নজর কাকে বলে। মুখ দেখেই মনে হয়েছে হিন্দু প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম পছন্দ হয়নি। মোল্লাদের প্রতিষ্ঠান হলে বস্তা উপুড় করে ঢালতেন অবশ্যই।

।। ১০।।

১৮.১২.০১— সকালে সূর্যোদয় দেখার বৃথা চেষ্টা। সঙ্গীগণ সহ প্রায় দু'মাইল হেঁটে Anthropological Museum দেখি। খুবই জ্ঞাতব্য ও শিক্ষাপ্রদ সংগ্রহশালা। বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর যেমন, জারোয়া, ওন্‌গী, সোম্পেন, সেন্টিনেল। বিলুপ্তপ্রায় এসব উপজাতি জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা (আনুমানিক) এরূপ : জারোয়া ১০০-১২০, ওঙ্গি ৯৮, সেন্টিনেল ৮০, সোম্পেন ২২৩, আন্দামানী ৪২। উপজাতির জীবনযাত্রা ও আলাদা আলাদা সংস্কৃতির পরিচায়ক নিদর্শনে ভরা। তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের ও হস্তশিল্পের নিদর্শন থেকে ক্রমক্ষীয়মান ও বিলুপ্তপ্রায় আদিবাসীদের অতীত জীবন সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া গেল। দুপুরে আশ্রমে ফিরে আহার ও বিশ্রাম। সুখবর হলো, লিট্‌ল আন্দামান যাবার সুযোগ হয়েছে। আজই রাত ৮টায়, হাট-বে'র টিকিট পাওয়া গেছে। সন্ধ্যায় লায়ন্স ক্লাব-এর সদস্যরা এলেন, তাদের সঙ্গে আলোচনা। ৭.৩০ মিনিটে জেটি ঘাটে পৌঁছাই। ৮টায় বোট ছাড়ে। অল্পের জন্য রক্ষা। বোটে ২০০ যাত্রীর বসার সীট, কিন্তু ৩০০-র বেশি যাত্রী উঠেছে। বোট ছাড়তেই প্রবল ঢেউয়ের দাপটে বোট দুলতে ও লাফাতে থাকে। যাত্রীরা বেশিরভাগ মেজেতে ও ছাদে শুয়ে পড়ে। আমি আরাম করে চেয়ারে বসার পরই মাথা ঘুরতে ও গা গুলোতে থাকে। বিছানা পাতার অপেক্ষা না করেই সটান মেজেতে শুয়ে পড়ি। তখন কারও পা-মাথা বাছার উপায় ছিল না। শুয়ে শুয়েই রুটি ও আলুভাজা পেটে চালান করে দিই। তাতে গা গুলানো কিছুটা কমে। সারা রাত বোটের সঙ্গে নাচতে নাচতে কাটে। বোঝা গেল জাহাজ ক্রমেই তীব্র ঢেউ ও প্রবল স্রোতের তাণ্ডবস্থল ১০ ডিগ্রি চ্যানেলের দিকে এগোচ্ছে।

১৯.১২.০১— নয় ঘন্টা অবিশ্রাম দুলুনি ও নাচুনির পর লিটল্ আন্দামানের হাট-বে জেটির সামনে জাহাজ দাঁড়াল। আধঘন্টা অপেক্ষার পর বোট এসে টেনে জাহাজ জেটিতে ঢোকাল। প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, নীল জল, সবুজ বন ও সোনালী বালুতটে কালো মেঘে আবৃত দিগন্তবিস্তারী আকাশ মিলে এক অপূর্ব দৃশ্য। অটো করে আমরা চারজন হাট বে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সভাপতি লালজন ওঁরাওর বাড়িতে ওঠা হল। কাঠ ও

টিনের বাড়ির দোতলায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা। আন্তরিক অভ্যর্থনা ও চা-জলপানের পর হাট-বে বাজারে গিয়ে দু'চার জন সঙ্ঘকর্মীর সঙ্গে আলাপ। জিপে গভীর বনের মাঝে White Surf ঝর্ণা দর্শনে যাত্রা। বনের গেট থেকে ২ কিমি হেঁটে এবং সর্বক্ষণ জোঁকের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে ঝর্ণার দর্শন ও স্নান চোখ জুড়ানো সৌন্দর্য। এই ঝর্ণার জল পরিশ্রুত করেই দ্বীপবাসীদের পানীয় জল সরবরাহ হয়। ফিরে এসে লালজনের ঘরে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজ। সাড়ে তিনটায় পি ডব্লিউ ডি-র অ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আশিষ ঘোষের অফিসে যাই। তাঁর গাড়িতে 16th KM বাঁধ দর্শনের পর উদ্বাস্তু উপনিবেশ রামকৃষ্ণপুরমে মহেশ মণ্ডলের বাড়ি ও বাজারে শ্রীঢালীর দোকানে সাময়িক বিষয় নিয়ে কথাবার্তা। এসব বসতি এলাকায় বেড়ানো ও কথাবার্তা থেকে বাংলা ছেড়ে যে ১২০০ মাইল দূরে আছি তা মনেই হয় না। আশিষবাবু পি ডব্লিউ ডি বাংলোতে থাকার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু নির্জন বাংলোয় না থেকে করুণাময়ের ঘরে খেয়ে ওঁরাওর বাড়িতেই শয়ন।

সরস্বতী শিশু মন্দিরে ছাত্র-ছাত্রীরা।

২০.১২.০১— ভোরে হাট-বে সমুদ্র সৈকতে বেড়িয়ে এসে লালজনের ঘরে টিফিন। বিজেপির স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে (মহিলা) আলোচনা। স্নানাহার ও বিশ্রাম করে ৩টায় গাড়ি করে ৫ কিমি দূরে অরবিন্দ বে-তে নিকোবরি বস্তিতে যাই। এই জাতির উৎপত্তি বেশ রহস্যপূর্ণ। এরা মঙ্গোল গোষ্ঠীভুক্ত। এবং ১৫০ বছর পূর্ব থেকে খৃস্টান ধর্মাবলম্বী। বিনা পারমিটে এ অঞ্চলে প্রবেশ নিষেধ। লালজন ওঁরাও সঙ্গে ছিলেন, তিনিই আমাদের পারমিট। যে গৃহকর্তার ঘরে আমরা বসি, তার কাছে শুনি, ক্যাপ্টেন ও সহকারী ক্যাপ্টেনের নির্দেশে এদের সমাজ পরিচালিত হয়। মিশনারীদের প্রেরণায় শিক্ষার হার বেশ উঁচু। যুবক-যুবতীদের মুক্ত মেলামেশা। একটু খর্বাকৃতি হলেও দেহের গঠন মজবুত। ফুটবলের খুব ভক্ত। নিকোবরি উপজাতিভুক্ত এদের মাচার উপর ঘর। ডাবের জলপানে আমাদের আপ্যায়ন করে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বিগত সুনামী-তে এই পরিবার সমেত কয়েক হাজার নিকোবরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে শুনতে পাই।

নিকোবরি বস্তি থেকে ফিরে এসে হাট-বে বাজারে মহেশ মণ্ডলের ছেলে সুশান্তর দোকান বসি। পরিবারটি হিন্দুত্ব অনুরাগী। সন্ধ্যায় স্থানীয় রামমন্দিরে কীর্তন, ধর্মীয় আলোচনা। মুখ্য ভূমিকায় শক্তিবাবু। সোমড়া ওঁরাওর বাড়িতে নৈশাহার। সাধারণ খাবার। কিন্তু আন্তরিকতায় মুগ্ধ। আগামীকাল পোর্ট ব্লেয়ার ফেরার টিকিট নিয়ে চিন্তা।

।। ১১।।

২১.১২.০১— ভোরে চা-পান ও গল্পসল্পের পর নির্মল সাঁইয়ের বাড়িতে ভারি টিফিন। টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা কম। স্নান সেরে জগদীশজীর বাড়িতে আহার। তিনি চাকরিতে বেরিয়ে গেছেন। তাঁর স্ত্রী আপনজনের মতো সযত্নে আহার করান। বেলা দু'টায় আশিষবাবুর গাড়িতে কৃষ্ণনালা গমন। মাইলের পর মাইল বন ধ্বংস করে পাম-এর চাষ। কিন্তু ক্ষুদ্রাকৃতি পাম গাছ কি বৃহৎ বনস্পতির শূন্যস্থান পূর্ণ করতে পারে? মোটেই দৃষ্টিনন্দন নয়।

কৃষ্ণনালায় বনের মধ্যে আদিবাসীদের মাঝে একমাত্র বাঙালী ছেলে বিপুল মণ্ডল সপরিবারে বাস করছে। সঙ্ঘের আদর্শে দীক্ষিত এই যুবক পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার বাসিন্দা, উদ্বাস্তু হয়ে লিটল্ আন্দামান দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে। কল্যাণ আশ্রমের কাজে নিবেদিত প্রাণ। শিশু মন্দির স্কুলের শিক্ষক এবং স্থানীয় মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক। আর একজন শিক্ষক হলেন বিমল বৈরাগী। সুদূর দ্বীপাঞ্চলে জনবিরল বনমাঝে আদর্শ আঁকড়ে পড়ে থাকা কি কম আত্মত্যাগ?

বিপুল মণ্ডলের বাড়িতে একটি গাভী যমজ বক্না বাছুর দিয়েছে। আজই প্রথম দুধ দুয়ে ক্ষীরের নাড়ু করে গৃহদেবতার ভোগে দিয়েছে। হঠাৎ পাঁচজন অতিথিকে বাড়ি ঢুকতে দেখে তারা স্বামী-স্ত্রী আনন্দে আত্মহারা। এ নিশ্চয়ই ঠাকুরের কৃপা, নইলে আজই অতিথি নারায়ণ এসে হাজির হবেন কেন? ক্ষীরের নাড়ু আর এক গ্লাস করে দুধ দিয়ে আমাদের সেবা করল। প্রায় ৫০ বছর পর ভুলে যাওয়া খাঁটি দুধের ও ক্ষীরের নাড়ুর স্বাদ পেয়ে

Office- 2236-5330/1594
Shop- 6534-9088
2838-1039
Resi.- 24988912

ELEGANT STORES

PAINTS

HARDWARE

ADVICE ON INTERIOR DECORATION
S.T.D / I.S.D / PAY PHONE

33, Tollygunge Circular Road.
Kolkata-700 053

Fax : 2654-8945
Phone : 6535-3233

Shree
Ganesh
Forging Co.

2/1, Haren Mukherjee Road
Belur - 711 202,
Howrah

Engineers & Re-Rollers

VIVEK & CO.

Exporters of Quality Jute Goods

16, N. S. Road, (4th Floor)
Kolkata-700 001

Phone : 2242 9234 / 2262-2318
Fax : 2243 2659

হর্ষবিষাদে মনটা ভরে গেল। যাই হোক, দু'একটা নাড়ু আমি অলক্ষ্যে পকেটে পুরে ফেললাম।

মন্দিরে ছাত্রছাত্রী অভিভাবক ও মাস্টার মশাইদের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে বিবেকানন্দপুরম্ হয়ে হাট-বে-তে ফিরে এসে শুনি মাত্র দু'খানা টিকিট পাওয়া গেছে। অবশেষে নানা ফন্দিফিকির করে বিশেষত আশিষবাবু ও অঞ্চল প্রধান সীতাদেবীর চেষ্টায় চারখানা টিকিটই পাওয়া গেল। আমরা তড়িঘড়ি স্টীমার ঘাটে হাজির হয়ে শুনি কার নিকোবর থেকে আগত স্টীমার আজ হাট-বে-তে থামবে না ও লোক তুলবে না। ঘাটে আমরা ছাড়াও আরও অনেক যাত্রী হাজির। চারদিকে হৈচৈ ব্যাপার। ওদিকে স্টীমার মাঝ সমুদ্রে দাঁড়িয়ে, ঘাটে ভিড়ছে না। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে আশিষবাবু এবং অঞ্চল প্রধানও হাজির হয়েছেন। অনেক যুক্তিতর্ক ও চাপাচাপির পর স্টীমার ঘাটে ভেড়ে। আমরাও ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়ি। সারা রাত উথাল-পাতাল করতে করতে পোর্ট ব্লেয়ারের দিকে এগোতে থাকি।

এই ফাঁকে একটু ব্যক্তিগত কথা সেরে নিই। আমি শক্তিবাবুকে আমার ইন্দিরা পয়েন্টে দাঁড়াবার আবাল্য পোষিত ইচ্ছার কথাটা জানাই। তিনি বললেন, সেখানে যাওয়া বড় হ্যাপা। প্রথমত পারমিট চাই, তারপর স্টীমার সার্ভিসের কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। পনের দিন অন্তর একবার যায় আসে। তাছাড়া

এক আন্দামানবাসী পরিবার। সুনামীতে পুরো এলাকার মানুষের সঙ্গে এঁরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছেন।

উত্তাল 'টেন ডিগ্রি চ্যানেল' পার হতে গেলে অনেকেরই বাহ্যি-বমি একাকার হয়ে যায়। আমি বললাম— তাই হোক, তবু আমার একবার ওই পয়েন্টে যাবার খুব ইচ্ছা, হোক না বাহ্যি-বমি একাকার। তিনি বললেন, এবার তো আর হল না, ভবিষ্যতে দেখা যাবে। কিন্তু সে ভবিষ্যৎ আর আসেনি, বাহ্যি-বমিও একাকার হয়নি। শক্তিবাবুর সঙ্গে দেখা হলেই আমি অনুযোগ করি, আপনি আমার বাহ্যি-বমি একাকার হবার সুযোগটাই আর দিলেন না!

যা হোক, স্টীমারে উঠে দেখি, কার নিকোবর থেকে আগত যাত্রীদের অনেকের বাহ্যি-বমিতে বাথরুম সত্যিই নরককুণ্ড।

বিধাতার অভিশাপ কিনা জানি না, বিগত সুনামীতে এই অপূর্বসুন্দর ইন্দিরা পয়েন্ট ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে গেছে কয়েক ফুট।

।। ১২।।

২২.১২.০১— ভোট ছ'টায় "Dering" পোর্ট ব্লেয়ার লঞ্চঘাটে ভেড়ে, শেষরাতে সমুদ্রবক্ষ থেকে সূর্যোদয়ের দৃশ্য, বাঁদিকে দ্বীপপুঞ্জের কালো ছায়া ও মাঝেমাঝে দীপাবলীর মতো বিদ্যুৎবাতির লহর এবং ডানদিকে অসীম সমুদ্রের অশান্ত তরঙ্গলহরীর দৃশ্য ভোলার নয়।

কল্যাণ আশ্রমের মূল কেন্দ্রে ফিরে স্নানাহার ও বিশ্রামান্তে দুখু ভগতের নির্মিয়মান মন্দির দেখতে যাই। মন্দিরের জন্য নির্দিষ্ট ঠাকুরমূর্তি জয়পুর থেকে তখনও তৈরি হয়ে আসেনি। তবু প্রতিষ্ঠা দিবসে উপস্থিতির নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখল।

দুখুরামের আশ্রমে গেলে তার গৃহিনী আমাদের পা ধুয়ে নিজের চুল দিয়ে পা মোছার উদ্যোগ করতেই সঙ্কোচে দাঁড়িয়ে পড়ি। তখন ভগত দম্পতি কাতরস্বরে বললেন— তাদের প্রথামত অতিথি সেবা থেকে যেন বঞ্চিত না করি। কি করা, ক'মিনিট আড়ষ্ট

হয়ে বসে থেকে চরণ সেবা নিতে হল। ছোটোবেলায় পাড়ার কীর্তনের আসরে দুলে দুলে গেয়েছিলাম— 'ঠাকুর, তোমার রাতুল চরণ নয়নজলে ধোয়াইব, কেশে চরণ মুছাইব'— তখন কি ভেবেছিলাম একদিন কেউ আমার এই ধূলিমাখা কৃষ্ণচরণ কলের জলে ধোয়াবে এবং কেশে সে চরণ মোছাবে?

দুখুরামের আশ্রম থেকে স্থানীয় ময়দানে আয়োজিত পর্যটন উৎসব দেখতে যাই। পর্যটন উৎসবে আন্দামানবাসী বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ লোক সংস্কৃতির চিহ্ন তুলে ধরে সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ যে মিনি-ভারত তার খাঁটি নিদর্শন মেলে ভাষাগত জনসংখ্যার নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান থেকে—

অসমীয়া	১৮
কুরগী/কাদাগু	১৯
বাংলা	৪৪,১৪৭
ডোগরী	৬
গুজরাটী	১১০
ইংরেজি	৯১
হিন্দী	৩২,৪৪৬
গোরখালি/নেপালী	২৫৪
কন্নড়	২৩৪
খারিয়া	১৯৭১
কাশ্মীরী	৫
কোঙ্কনী	২৪
মালায়লাম	১৮,৬৬২
কোরাঙ্খ/ওঁরাও	৫৭৬১
মারাঠী	৩৩২
মুণ্ডা	১৮৬৬
ওড়িয়া	৯১
মুন্দারী	৪৭৬
পাঞ্জাবী	১৭৭৫
নিকোবরী	২১,৪২৪
সিন্ধী	১৪
সাঁওতালী	৬
তামিল	২৬,৪৮৫
টুলু	২
তেলুগু	১৭,৬৩২
গোন্দস/মুড়িয়া	৫
উর্দু	১৭৯৭
লুসাই/মিজো	৬
অন্যান্য ভাষাভাষী	৩২২৬

(সূত্র : সেনসাস রিপোর্ট, ১৯৮১)

উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকেন এবং ভাষণ দেন দ্বীপপুঞ্জের লেঃ গভর্নর এবং বিজেপির সাংসদ বিষ্ণুপদ রায়। ফেরার পথে রাজ্য গ্রন্থাগার এবং পাঠাগার পরিদর্শন করে আসি।

।। ১৩।।

২৩.১২.০১— সকাল ৬.৩০ মিনিটে হ্যাভলকের উদ্দেশ্যে যাত্রা। যাত্রীর প্রচণ্ড চাপ। লঞ্চ ঘাটের কাছাকাছি স্থানে বেড়িয়ে খাঁটি বাঙাল হোটেলে পূর্ববঙ্গীয় রান্নার স্বাদ গ্রহণ। চারপাশে বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনার ভাষার কথার টান। উত্তাল সমুদ্রের বুকে টালমাটাল খেতে খেতে ৫০ কিমি অতিক্রম করে সন্ধ্যা ৬টায় পোর্ট ব্লেয়ার ঘাটে। 'শিশুতীর্থে' গিয়ে এক ঘন্টা অনুষ্ঠান উপভোগ।

আগামীকাল কলকাতা ফেরার টিকিট কাটা হয়েছে। আমার ও সোমেনবাবুর কেবিন, মিলনবাবু বাঙ্কে। শক্তিবাবু পরদিন প্লেনে ফিরবেন।

২৪.১২.০১— অদ্য শেষ রজনী। মন চল নিজ নিকেতনে। জাহাজ তিনটায় ছাড়বে। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আশ্রম ছাড়ি। শক্তিবাবু জাহাজ ঘাটায় এসে আমাদের বিদায় দিলেন। পাঁচটায় জাহাজ ছাড়ে। শুরুতেই বিপত্তি। ৩২৩-এর বদলে ৩২৫ নং কেবিনে স্থান দেয়। সেখানে মদোমাতালের উৎপাত। নালিশ জানিয়ে ৩১৯-এ স্থানান্তর। বিজয় মহান্তীর স্ত্রী রুটি ও আলুর ছক্কা তৈরি করে দিয়েছিল। তাতেই রাতের আহার সারি। এ ক'দিন মহান্তী দম্পতির সেবাযত্নের কথা আজও মনে পড়ে।

ফিরতি পথে আবার ওপর নিচতলা ও চারধার ঘুরে ঘুরে দিনে রাতে সূর্যালোকে চন্দ্রালোকে আলোকে আঁধারে জলকেলি দেখি। অন্যেরা আন্দামানে কে কি দেখে আনন্দ পান জানি না, আমার কিন্তু এই জল দেখাতেই আনন্দ!

শেষ করার আগে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম সম্পর্কে আরও দু'একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি :—

''ভিন্ন ভিন্ন রীতি-রেওয়াজ নিয়ে ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশে ছোট-বড় ৭০০ জনগোষ্ঠী ছড়িয়ে রয়েছে। সকলের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন। সামাজিক প্রথা, উৎসব, জীবনযাত্রা প্রণালীতেও রয়েছে ভিন্নতা। তবুও তাদের ব্যবহারে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। অতিথিপরায়ণতা, মাতৃজাতির প্রতি শ্রদ্ধা, বয়স্কদের প্রতি সম্মান, সারা গ্রাম এক পরিবার-এর বোধ, পরিবারের সমস্ত কাজ পরিবারই করে— এই ধরনেরর উচ্চ স্বাবলম্বনবোধ, অলিখিত সাহিত্যের প্রতি দিব্য রসানুভূতি, নিজেদের শ্রদ্ধাস্থলের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি— এই বিষয়গুলি প্রায় সমস্ত জনজাতির ক্ষেত্রেই দেখা যায়। প্রাচীনকাল থেকে নিজেদের পরম্পরা, পূজা-পদ্ধতিকে এমনভাবে মেনে আসছে যে, সমাজের মধ্যে সুখ-দুঃখকে সমভাব, বিশ্বাস-অন্ধবিশ্বাসকে সমাজ রূপে স্বীকার করে নিয়েছে।

বনবাসী কল্যাণ দু'ভাবে কার্যরত। বনবাসী ক্ষেত্রের বেদনা উপলব্ধি করে আশ্রমের কার্যকর্তাদের সেবার মাধ্যমে সমাজকে সমর্থ করে তোলার চেষ্টা করছে। বর্তমানে সারা দেশে ১৬৭২২টি সেবাকার্যের মধ্যে দিয়ে জনজাতি ক্ষেত্রের বিকাশে কল্যাণ আশ্রম কার্যরত। ২০৯টি ছাত্রাবাস চলছে যেখানে ৫৮১৬ জন বালক ও ১৫৭৩ জন বালিকা আবাসিক থেকে শিক্ষাগ্রহণ করছে। শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ প্রায় ৩৬৬৬, চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রায় ৩৩৮৯, সেবাকার্য, আর্থিক বিকাশের ক্ষেত্রে ২৫৩২ সেবাকার্য, প্রায় ২৩৯২ ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৫০৭৪ শ্রদ্ধাজাগরণ ও লোকসংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্র ছাড়া আরও কিছু সেবাকার্যের মধ্য দিয়ে আশ্রমের কাজ সতত গতিশীল রয়েছে। দেশের প্রায় ১০৯২ বিকাশখণ্ডে ১১৩৯৩ গ্রাম সমিতি এবং ১০২৮ পূর্ণ-সময়ের কার্যকর্তাদের মাধ্যমে এই সেবাকার্য নিরন্তর এগিয়ে চলেছে।

আসা-যাওয়া নিয়ে প্রায় ২৭ দিন। এই ২৭ দিন যেন এক ঘোরের মধ্যে কেটেছে। কত অজানা অচেনা বাড়িতে অতিথি হয়েছি; বনবাসী উপজাতিদের ঘরে ভাত খেয়েছি। বিচিত্র তাদের রান্নার পদ্ধতি, বিভিন্ন তার স্বাদ। সবসময় মুখোরোচক না হলেও আন্তরিকতা রসে ছিল ভরপুর। সভ্যতাগর্বী আমরা এদের সরল আতিথেয়তা, আত্মীয়তা গ্রহণ করতে তো প্রাণখুলে মিশিনি; তারই পরিণতি আজকের জঙ্গল মহল ও মাওবাদী তাণ্ডব। স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু শতাধিক বছর পূর্বেই আমাদের সতর্ক করে বলেছিলেন— হে, ভারত ভুলিও না.... ইত্যাদি।

২৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ঘোর হতেই সাগরদ্বীপের লাইট হাউসের আলো চোখে পড়ল। আমিও কেবিনে ঢুকে শুয়ে পড়লাম। সাগর থেকে খালে ঢুকতে কারই বা ভালো লাগে।

জন্মভূমির খাল-বিল নদী-নালার মোহিনী স্মৃতি ক্রমেই ধূসর হয়ে এলেও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে সর্বক্ষণ জলস্থলে কোলাকুলির দৃশ্য আজও হাতছানি দেয়। ▯

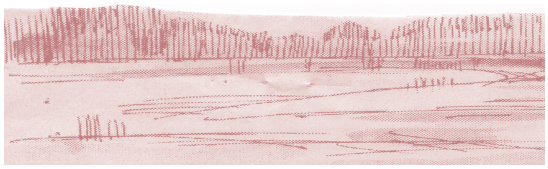

With Best Compliments :

R. C. BHANDARI (HUF)

8, Camac Street

36, Basement

Kolkata - 700 017

গণেশ

আটা, ময়দা বেসন ব্যবহার করুন

৮৮, বড়তলা স্ট্রীট, কলকাতা-৭

ফোন ঃ ২২৬৮৬১৬০, ২২৭১-৫৭৬১

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

A Well Wisher

K. M. AGARWAL

Kedia Fabrics

Kamal Kumar Kedia

Mfg. & Dealer of Fancy Sarees

160, Jamunalal Bazaz Street, 2nd Floor,
Kolkata-700 007

(s) 2272-5487

Mob : 9331105467

Mfg. by : Ringo Foods &
Beverages (P) Ltd.